তন্‌চংগ্যা শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা

প্রকাশনায়

পহ্‌র জাঙাল প্রকাশনা পর্ষদ

Scanned with CamScanner
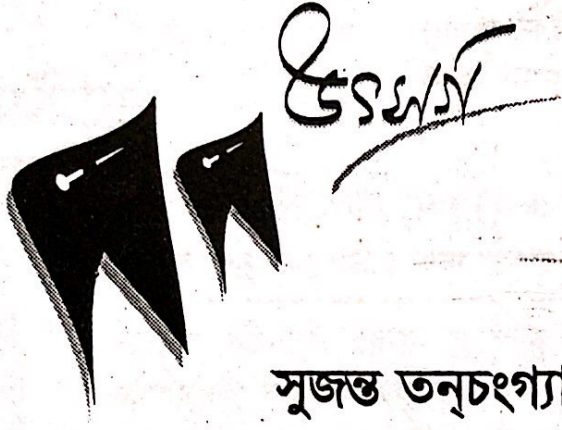
সুজন্ত তনচংগ্যা

আমাদের বন্ধু, সহযাত্রী, সহযোদ্ধা ও সহকর্মী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তাঁর অকাল মৃত্যুতে 'পহ্‌র জাঙাল' প্রকাশনা পর্ষদ পরিবার পক্ষ থেকে গভীর শোকাঞ্জলী এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনায়....

কে. শুদ্ধোধন তঞ্চঙ্গ্যা
বাংলাদেশ বেতার, রাঙ্গামাটি।
তঞ্চঙ্গ্যা সংবাদ অনুবাদক ও পাঠক
মোবাইল : ০১৮৪০৭৭৪৯৬২

পহ্‌র জাঙাল
(একটি তনচংগ্যা শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা)

কর্মধন তনচংগ্যা কর্তৃক সম্পাদিত ও পহ্‌র জাঙাল প্রকাশনা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত।

পহ্‌র জাঙাল

৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (বিশ্ব আদিবাসী দিবস সংখ্যা)

২৫ শ্রাবণ, ১৪১৬ বাংলা, ৯ আগষ্ট, ২০০৯ ইংরেজী

সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদক :

কর্মধন তন্‌চংগ্যা

সদস্য/ সদস্যা :

রাজুময় তঞ্চঙ্গ্যা (চ.বি.)

ত্রমিল তঞ্চঙ্গ্যা (চ.বি.)

সন্তোষ তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

সুদীপ্তা তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

প্রনব তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

বিশ্বলাল তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

জ্যোস্না তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

দিলীপ কান্তি তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

শ্রীজ্ঞান তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

রবিন তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

প্রজ্ঞামিত্র তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

মধুমনি তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

সুভাষ তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

বিমল তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

খোকন তন্‌চংগ্যা (চ.বি.)

মনি স্বপন তন্‌চংগ্যা (চট্টগ্রাম কলেজ)

বিশেষ সহযোগিতায়

ডাঃ জয়ধন তন্‌চংগ্যা

রাজুময় তঞ্চঙ্গ্যা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :

কর্মধন তন্‌চংগ্যা

প্রচ্ছদের ছবি :

ডাঃ জয়ধন তন্‌চংগ্যা

মুদ্রণে :

মাল্টি জোন

১৮২, আল-ফাতেহ্ শপিং সেন্টার

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ০৩১-২৮৬২২৫১

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

২১৫, এস. আলম কটেজ

১নং গেইট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শুভেচ্ছা মূল্য : ৪০/= টাকা

সম্পাদকীয়

রাঙামাটির পিটিআই (PTI)-এ
সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা কোর্স চালু করা হোক

পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব সংস্কৃতির স্বকীয়টাই স্বতন্ত্র এটা আর নতুন করে বলার বিষয় নয়। কিন্তু এই স্বকীয় সংস্কৃতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা কতটুকু স্বতন্ত্রভাবে লালন-পালন করতে পারে- প্রশ্ন এই জায়গায়। আমরা একটা বিষয় কমবেশী সবাই হয়তো অবগত পার্বত্য চুক্তিতে- পার্বত্য অঞ্চলে প্রাথমিক স্তরে সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত তারই ধারাবাহিকতায় রাঙ্গামাটি পিটিআই-এ 'চাকমা শিক্ষা কোর্স' চালুর মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠীর প্রাইমারী শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাকমাদের মতো তাদের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা কোর্সও চালু করার জোর দাবী জানাচ্ছি। আর এর সাথে আমাদের আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে দু'একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করে তা যেন অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়। যেটি বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান স্যারও একবার এক সেমিনারে বলেছিলেন (২৬/০২/০৫ প্রথম আলো)। তবে এটা যদি করা হয় বা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এটি হবে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ভুল।

বিশ্ব আদিবাসী দিবসে সকলকে শুভেচ্ছা

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র

নিবন্ধ

পান্ডুলিপি থেকে

পৌরাণিক গল্প

ঐতিহাসিক মিশ্রিত আধুনিক গল্প

কবিতা (বাংলা ভাষায়)

গল্প

কবিতা (তন্‌চংগ্যা ভাষায়)

কবিতা (বাংলা ভাষায়)

Scanned with CamScanner

প্রবাদ ও তন্চংগ্যা প্রবাদের সাংস্কৃতিক অভিমুখ

ড. মনিরুজ্জামান
"(তথ্য সংগ্রহে: কর্মধন তন্চংগ্যা)"

বাংলা ভাষা ও পার্বত্যজাতির ভাষার মধ্যে গোত্রগত বা নৃতাত্ত্বিক সূত্রের ব্যবধান যোগাযোগসূত্রকে কখনও খণ্ডিত বা ব্যাহত করে নি। তার একটি প্রমাণ প্রবাদের ব্যবহার –সমতা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তুলনামূলক পঠন–পাঠন প্রক্রিয়ায় বিচার করে ধারণা দিতে চেষ্টা করেছিলেন যে বাংলাদেশের 'হাঁউ মাঁউ খাঁও, মানুষের গন্ধ পাঁও' জার্মান শিশুদের কাছেও নিজস্ব জিনিষ হয়ে আছে এবং কখন কিভাবে এই নৈকট্য সৃষ্টি হয়েছিল তা অনুসন্ধানের বিষয় মাত্র। কিছুদিন আগে তুলনামূলক সংখ্যা বিচার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গণিত ভাষাবিজ্ঞানীগণ অবাক হয়ে দেখেছেন যে সংখ্যাশব্দ ভ্রমণশীল। (এ বিষয়ে 'ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন' গ্রন্থে আমার বিস্তারিত আলোচনা আছে।) একইভাবে পূর্ব ইউরোপে যাঁরা লোকসাহিত্য নিয়ে তুলনামূলক কাজ করেছেন তাঁরা এই বিষয়টা আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং সে সব তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমুলক আলোচনা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে Broken down myth theory, Historical-geographical contact theory বা ফিনিশিয়ান তত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে। এসব তাত্ত্বিক ধারণা এখন আরও প্রসার লাভ করেছে এবং বিলাত আমেরিকা ও বিশেষত ফিনল্যান্ডে অনেক অগ্রসরতা ঘটেছে। Tribal Culture নিয়েও দক্ষিণ ভারতে এবং Red Indian –দের বিষয়ে গাম্পার্জের অনুসৃত ধারায় নৃ–ভাষাতত্ত্বে এবং এলার্ন ডান্ডি, লী উটশী প্রমুখ লোকবিদগণের হাতে গবেষণার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ অজস্র ও বৈচিত্রশালী লোকউপাদানের দেশ। কিন্তু এদেশের সম্পদ নিয়ে শিক্ষা–সংস্কৃতির জগত এখনও নিশ্চুপ। একদা রমারোঁলার কথায় আমাদের প্রত্যয়ের কিছুটা প্রসার ঘটেছিল। মূলভূখণ্ডের বিষয় নিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করা গেলেও (যথা– বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য' সিরিজ, ইত্যাদি), আমাদের নিকট প্রতিবেশীদের লোকগত প্রথা ও জ্ঞান নিয়ে কখনও কেউ কোন কৌতূহল বোধ করেন নি। ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ – এর 'কর্ণফুলি'–র পথ দিয়ে এই তথ্য উন্মোচনের শুরুটা ঘটেছিল, পরবর্তীকালে সে পথের খননী কাজ আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। পার্বত্য সংস্কৃতিকে মূল সাংস্কৃতিক ধারা থেকে সব সময়ই দূরে রাখা হয়েছে। নৈকট্য সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে ওঠেনি কখনও। এই চিত্র কেবল বাংলাদেশেরই নয়; রেড ইন্ডিয়ানদের দেশ সহ সর্বত্রই একই চিত্র; কেবল মাত্রা ভেদ।

সাঁওতাল, ত্রিপুরা ও অন্যান্য সমতলীয়তা মিশ্র সমতলী ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীর সাথে বিশেষত দক্ষিণ–পূর্ব পার্বত্য এলাকার নৃ–গোষ্ঠীগুলির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন–যাপনের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। একসময় আরাকান–ব্রহ্মদেশের সাথে এদের একটা সংযোগ ছিল এবং তারও আগে

Scanned with CamScanner

দক্ষিণ চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথেও যোগসূত্রটি গভীর ছিল এই সব জনগোষ্ঠীর। তাদের মধ্যে যারা স্থায়ীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে (বৃটিশ আমলে ও পরেও যাকে CHT বলা হত প্রশাসনিক সুবিধার্থে) বসতি স্থাপন করে অদ্যাবধি স্থায়ী হয়ে আছে, অর্থাৎ লুসাই কুকি প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর অংশ বিশেষ যারা সিলেট ও আসামের দিকে বসতান্তরিত হয়েছে তাদের কথা বাদ দিয়ে,- অন্যদের সাথে স্থানীয় অধিবাসী ও মূল ভূখণ্ডের প্রশাসকদের রাজনৈতিক ছাড়াও আর্থ (বাণিজ্য ঘটিত)- সামাজিক সম্পর্কটি ছিল হার্দ্য এবং দীর্ঘ দিনের। রানীর হাট, মহামুনি, কাপ্তাই বা রাজস্থলী এমনকি বান্দরবান অদ্যাবধি পাহাড়ী ও সমুদ্রতীরের বাসিন্দাদের মিলনস্থান হয়ে আছে এই ভাবেই। এই সব স্থানের বার্ষিক মেলাগুলি উভয় জনগোষ্ঠীর জন্যই আজও আকাঙ্ক্ষিত। তথাপিও ওপর ও নীচের বাসিন্দাদের মধ্যে সাংস্কৃতিকভাবে সেই নৈকট্য সূচিত হয়নি - ভাষাতত্ত্বে যাকে বলা হয় Linguistic Convergence এবং নৃতত্ত্বে Acculturation; এর কোনটাই সৃষ্টি হয়নি দীর্ঘকাল পাশাপাশি অবস্থানের পরেও। সে কি কেবল উভয় জাতির অন্তর্গত রক্ষণশীলতা না অন্য কিছু?

অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যায় পার্বত্য জাতির অনেকেই একটি মধ্যবর্তী ভাষাও ব্যবহার করে থাকেন, অথবা সেই রকম কোনও মিশ্র বুলি বললে তারা তা বোঝেন এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এটাই স্থানীয়ভাবে 'ফাংশনাল' বা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিভাষায় বলা যায় 'কার্যকারিণী' ভাষা বা প্রকাশ। ভাষা হিসাবে তা স্পষ্ট নয়, কিন্তু পারাস্পরিক ভাব বিনিময়ের জন্য তা মোটামুটি কার্যকরী। তুলনা দিয়ে বলা যায়, আলতামিরা গুহায় যে চিত্রলিপি বা রেখাবয়ব পাওয়া যায় তা যেমন লিপিও নয় চিত্রকর্মও নয়, কেবলমাত্র টোটেমের নিদর্শন ও যাদুধর্মের বিকাশ,- ভাষার ক্ষেত্রে আদি মানুষের অভিব্যক্তিও সেই রূপ অর্থাৎ অন্যের কাছে নিজেকে উপস্থিত করারই একটা চেষ্টা। 'ইন্দ্রধ্বজ' দেখিয়ে অসুর বা সাধারণ মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টা বিশুদ্ধ নাটকে থাকলেও 'নাটগীতে' তা থাকেনা। সে রকম সাধু বা শিষ্ট ভাষার শিক্ষণ বা ব্যবহার যাদের নেই তারা গড়ে তুলে 'লোকভাষা'? এখানে বুঝাতে চেয়েছি ভাষা সংস্কৃতির অংশ, কিন্তু মুখে বলা আর মুখের কথাকে স্থায়ী করার মধ্যে প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ সূত্রই ভাষাকে সীমিত করে আর ভাষিক উপাদানকে অন্যের অংশীদারিত্বে নিয়ে যায় আরও দূর। তখন বাংলার রাক্ষস জার্মানেও হাঁউ মাঁউ করে, প্রকাশ ভঙ্গী যেমনই হোক। India theory- তে এভাবেই জার্মানী লোক উপাদান আর ভারতীয় লোকউপাদানে সমতা দৃষ্ট হয়।

লোকসাহিত্যের অনেক শাখা, অনেক তার বিস্তার। কিন্তু সব শাখাই ভ্রমণশীল নয়। আবার Cosmic theory অনুযায়ী অনেক বস্তুই স্বতো:স্ফূর্ত কিংবা 'সাধারণ' হিসাবে জাত। 'শাদীর রাতে বিড়াল মারা' রেড ইন্ডিয়ানদের জীবনেও 'That's for once' গল্পে পাওয়া যায়, কেবল 'বিড়াল' এর স্থলে সেখানে এসেছে 'ঘোড়া'। আবার অনেকের মতে এবং এই মত সর্বজন স্বীকৃত যে লোক-সাহিত্য বা সংস্কৃতি জিনিষটা খুবই স্থানিক- Insularity তত্ত্বে সে কথা

প্রমাণিত। পাশাপাশি থেকেও দুই গোত্র বা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জগৎ ভিন্ন থাকে। এটা নদী-পর্বতের মত প্রাকৃতিক বাধা বা Sibolethistic পরিবেশের কারণেও হয় বা হতে পারে, তেমনি আবার স্বতন্ত্র,'Cultural Area' (তুলনীয়ঃ 'India is a clutural Area'-E.B. Emenw) বা 'Sub-Area'-র কারণেও হতে পারে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বা সীতাকুণ্ড, নোয়াখালীর ভৌগোলিক অবস্থানগুলি এক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে দূরত্বের মাঝে নৃতাত্ত্বিক প্রসঙ্গটিও বিদ্যমান। কিন্তু মনে রাখতে হবে চাকমাদের বা তন্‌চংগ্যাদের সাথে সেই দূরত্বটা প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বাধা হয়ে থাকে নি। অথচ অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সাথে সেটাই কম বেশি প্রধান বাধা হয়ে আছে। Comparative Folk Studies আমাদের সে তথ্য বিচারে সহায়ক হতে পারে। আইরিশ লোকবিদ পাদরী জেমস লঙ্ বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ ও আলোচনার যেমন অন্যতম অগ্রপথিক, রাশিয়ায় অবস্থান কালে তেমনি তিনি রুশ প্রবাদ নিয়ে তিনি তেমনি শ্রেণীকৃত ও তুলনামূলক আলোচনা করেন। দুস্প্রাপ্য হলেও মহাদেব প্রসাদ সাহা ঠিকই বলেন, তাঁর আলোচনা এখনও আমাদের জন্য আদর্শ বিশেষ।

বলা হয় প্রবাদ আদি সমাজের সৃষ্টি। প্রাক-সভ্য সমাজে মানুষ কি জ্ঞান-বৃত্তির চর্চা করতো? যেহেতু প্রবাদ Folk wisdom - এর ভান্ডার তাই সে কথা মেনে নিতে হয় এবং বিশ্বাস করতেই হয়। যেমন কৃষি জীবনের বিষয়গুলো যা আসলে যাদু নির্ভরতার শিকারী জীবন (গুহাবাস) এবং আরও পরে পশু পালনের জীবন ও পশুচারণ ক্ষেত্র সন্ধানে যাযাবর জীবন যাত্রার পরবর্তী জীবনেরই এক বাস্তবতা। তবে শুরুতে সম্ভবত সে জীবনও ছিল অধিক সংগ্রাম মূখর ও অনিশ্চিত এবং তাতে প্রাপ্তি ছিল কম। মানুষ স্থায়ী, অধিকতর নিশ্চিত ও সঞ্চয়ী জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয় যখন পশু মড়ক ও অতিরিক্ত পশু নিধনের ফলে অবিকল্প কৃষিজীবন তার কাছে সত্য হয়ে ওঠে। সূর্যদেব, মেঘদেবতা, জননী ধরিত্রী-চিন্তা এবং ক্রমে পুরাণ-তত্ত্বের (মিথলজি) কল্প-বাস্তবতায় প্রবেশ ঘটলো তার। দলবদ্ধতা আগেই ছিল, এখন বহু দলের সমাজ গঠন, আত্মরক্ষার্থ ও সঞ্চিত সম্পদ রক্ষার্থ প্রভৃতি পূজা, কৌম সমাজ রক্ষার ব্যবস্থায় নতুন করে এলো যাদু-মন্ত্র ও দলপতির মাধ্যমে দৈব বাণী। একেই আমরা বলি আদিম ধর্ম এবং তার আচরিত কথাসূত্রগুলিকে বলতে পারি আদি মহাজন বাক্য। ড. আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, '(আদিম) সমাজে যিনি ছিলেন বয়স্ক এবং অপেক্ষাকৃত বিচক্ষণ, বিভিন্ন যাদুবিদ্যার অধিকারী, তিনিই সাধারণত হতেন দলপতি, তাঁর বাণী বা নির্দেশই ছিল আদিম প্রবাদ বাক্য। পরবর্তীকালে আর্যদের আগমনের পর যাকে বলা হয় জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা,আবহাওয়াবিদ্যা এবং পরিবেশবিদ্যা, যা তার চারপাশের দর্শণীয় বস্তু- তা নিয়েই প্রবাদের প্রাচুর্য গড়ে উঠেছে। লিখিত উপকরণের অভাবে এই মৌখিক দৃষ্টান্ত, উপদেশ বা অনুকরণীয় বিষয়গুলি অতি সহজেই শ্রুতিধর ব্যক্তিদের মাধ্যমে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম, এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে এমনকি এক দেশ থেকে অন্য দেশেও পৌছে যায়।'

Scanned with CamScanner

সমাজপ্রিয় মানুষ উন্নত ও শক্তিধর সমাজের অনুকরণেও আসক্ত। তার সমাজ জিজ্ঞাসা ও আন্তসামাজিক কৌতূহল তাকে এই আচরণে লিপ্ত করে। আকাশ-সংস্কৃতির যুগে আজ মানুষ সমানাধিকারের চিন্তা করতে শিখেছে সেও এই ভাবেই। নারীবাদ, ধরিত্রী সম্মেলন, মানবাধিকার প্রভৃতি ধারণা ও কার্যক্রম যে প্রসারতা পেয়েছে ও তা যে ক্রমেই প্রসারমান হচ্ছে তার মূলেও সেই একই লোকজীবনের সত্যের তাড়না। 'সিবোলেথের' বাধা সত্ত্বেও অন্যের সংস্কৃতি জগতে আপনার কৌতূহলী প্রবেশ সাধারণ- সেখানে সে আপনার অন্তর্সত্যকে যেমন প্রকটিত করতে চায় তেমনি অন্যের সত্যমূলকেও সে স্পর্শ কতে চায়। এ যেন সেই রবীন্দ্র বারতা-'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে'। 'ভাষা' যদিও সীমিত 'কোড', সংস্কৃতি সেক্ষেত্রে অনেক তরল ও প্রবাহমূলক 'ফ্লুইড' স্বরূপ। প্রবাদ, ধাধাঁ প্রভৃতি লোকসৃষ্টি এমন কি যা 'লোকভাষা' তারও বহু উপাদানকে তাই আমরা ভ্রমণশীল রূপে দেখতে পাই। অনুকূল ও প্রতিকূল সমাজ নির্বিশেষে 'এক-সংস্কৃতি' এলাকা ('One Cultural area') গড়ে ওঠে, যেভাবে গোটা ভারতবর্ষে ৪০০- এর অধিক ভাষা থাকা সত্ত্বেও ইমেন্যূ সাহেব তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন যে, 'India is a linguistic area'.

এভাবে একটা কথা যোগ করা আবশ্যক যে গ্রামীণ সংস্কৃতি যতটাই স্থানিক, লোকসংস্কৃতি ততটাই অসংকীর্ণ ও বিস্তৃত। গ্রামজীবনের অনেক জিনিষ লোকসংস্কৃতির ধারক বা পরিচায়ক নয়, যেমন গ্রামেও আজকাল 'বিউটি পারলার' দেখা যাচ্ছে এবং পাল্কীর পরিবর্তে নতুন বর বধু রিক্সায় শ্বশুরালয় বা পিত্রালয়ে যাচ্ছে। একইভাবে গ্রামীণ যে কোনও অনুষ্ঠানে সামাজিক হোক বা ব্যবসায়িক হোক তাতে সারাদিন-রাত মাইকে গান বাজানো হয় এবং সে সব গান সিনেমার গান, এমন কি হিন্দি গানও। মানুষ গ্রামেও লোকস্বভাবের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। এগুলি গ্রামের অবস্থাপন্ন মানুষদের প্রদর্শনী মনোভাব বা রুচির একটি দিক। গ্রামীণ ব্যাংকের কারণে গ্রামের দরিদ্র মানুষেরাও বিশেষত মহিলার মোবাইলে অহরহ প্রবাসী স্বামী বা পুত্রের সাথে কথা বলে। এসবই গ্রামীণ বাস্তবতা, কিন্তু লোক সংস্কৃতির সৃজনশীল কর্মের সঞ্চারণ রহিত।

অন্যদিকে শহুরে সংস্কৃতিতে লোকসংস্কৃতির অনায়াস বিস্তার বা প্রভাবও অগ্রামীণ, কিন্তু লোকজ। যথা বৈশাখী মেলা বা রমনার বটমূলে নববর্ষ উদযাপন এবং স্বাধীনভাবে সৃষ্ট শহীদ দিবস, বিজয় মেলা, চিকামারা বা দেওয়াল লিখন, প্রভাতফেরী, মিছিল এমন কি গ্রন্থমেলাও। এখন আন্তর্জাতিকভাবে 'কাবাডি খেলা' ও অন্যান্য লোকজ খেলা ('লাঠি খেলা' ইত্যাদি) প্রভৃতির প্রদর্শণী হতে শুরু করেছে। সবগুলিতে লোকজ জীবনের পরিচয় শতভাগ না থাকুক এগুলিও যে আধুনিক প্রসারিত ধারণায় ফোকলোরের উপাদান সম্বলিত তা মানতেই হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে তা 'পরম্পরাগত' (ঐতিহ্যবাহিত) কিনা তা প্রমাণ সাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু পরম্পরাভাবই ফোকলোরের মৌল বিষয় নয়, লোক গ্রাহ্যতাই তার মূল পরিচয়কে সনাক্ত করে। তাই কখনও যদি গ্রামে মোবাইল ব্যবহার, মাইকিং (ওয়াজ মাহফিল বা জানাজার সময় ঘোষণীয় ইত্যাদি) ইত্যাদিতে লোকরূপ লক্ষ্য করা যায় এবং লোকজ শৈল্পিকতা বা সৃজনশীলতার রূপ প্রকাশ পায়

Scanned with CamScanner

তখন তা 'ফোকলোর' বা লোকসংস্কৃতি রূপেই গৃহীত হবে তা যত আধুনিকই হোক।

লোক সংস্কৃতির উপাদান সমভূমিতেও যা, দ্বীপাঞ্চল বা পার্বত্য এলাকাতেও তাই। যা ফোকলোর তার ভিন্নতা নেই কোথাও, স্থানভেদে তার বৈচিত্র্য ঘটতে পারে মাত্র। কিন্তু তার 'উপাদান' সর্বত্র সমরূপী। সাধারণ বা লোক মানুষের স্বভাবের জন্যই তার এই সমরূপিতা বা সমমৃদ্ধিতা এবং বৈচিত্র্যও। যেমন, প্রাক ইসলামী যুগে আরববাসীরা কবিতা ভালবাসতো, হাটেবাজারে গিয়ে একজন কবিতা পড়ে শোনাতো, লোকেও তা শুনতে পছন্দ করতো। প্রাচীন কা'বার মেলায় ইমরুল কায়েসের কবিতা বিনোদনের অন্যতম বিষয় ছিল। ভারত উপমহাদেশে আজ যে মুশায়রা হয়, সেটা তারই স্থানীয় রূপ মাত্র। ভূত প্রেত ডাইনী নিয়েও বিভিন্ন দেশের ধারণার সমিলতা আমাদের এইভাবে অবাক করে। আমাদের দেশে বাচ্চাদেরকে জুজু-র ভয় দেখানো হয়। এই 'জুজু'র উৎপত্তি ও তার বিভিন্ন ধরণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন 'লোককৃতি কথাগুচ্ছে'র গ্রন্থকার লোক ও শিশুসাহিত্য গবেষক আতোয়ার রহমান। 'পরী' এবং সমরূপী অন্যান্য জীব নিয়েও অনেক তথ্য উপস্থিত করেছেন তিনি। ধারণাগুলি আদি লোকজীবনের নানা রহস্যগুণাত্মক।

এইবার পার্বত্য ও সমভূমিজ প্রবাদের কথায় আসি। আমি অন্যত্র বলেছি বাংলাভাষায় 'প্রবাদ' একসময় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। যেমন, প্রবাদ আছে মানুষ অপকর্ম করে মারা গেলে বা অতৃপ্ত আশা রেখে অপমৃত্যু ঘটলে তার আত্মা গাছে বেতালের মত ঝুলে থাকে। অর্থাৎ জনশ্রুতি, সুভাষণ, মহাজন উক্তি, মিনতি শিলুক প্রভৃতি অর্থে বা ভাবার্থে 'প্রবাদ' -এর ব্যবহার ছিল। লঙম্যান চৎড়াবৎন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন উইলিয়াম মর্টন বা নীলরত্ন হালদার প্রমূখ তাঁর পূর্বসুরীরা 'কবিতারত্ন', 'দৃষ্টান্ত বাক্য' প্রভৃতি শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহৃত করেছেন। (দ্রষ্টব্য মৎ প্রণীত 'লোকসাহিত্যের ভিতর ও বাহির' দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২:পৃ. ১০১-১০৩)। ইংরেজী শব্দের সাথে ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকায় তিনি 'প্রবাদ' কথাটি ব্যবহার করেন এবং এই অর্থেই শব্দটি প্রচলিত হয়ে অভিধানেও স্থান পায়। প্রবাদের বৈশিষ্ট্য বা গুণ তার চিরত্ব, শব্দ প্রকৃতির বৈচিত্র্য (বাঘ/বাঘা; জুতা / জুতুয়া ইঃ) ও যদৃচ্ছাকৃত বাক্যরূপ।

এই ধরণের প্রবাদের কথা আমি প্রথমে আমার পার্বত্য এলাকার বন্ধু বা ছাত্রদের মুখে বিশেষ শুনতে পাই নি। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি থাকা কালে ছাত্রদের নিয়ে মানিকছড়িতে (খাগড়াছড়ি) ফিল্ড ওয়ার্ক করার সময়ও তেমন তথ্য লাভ করতে পারিনি। ১৯৮০-০৩ ড. দুলাল চৌধুরী 'চাকমা প্রবাদ' প্রকাশ করেন। কিন্তু সংকলনটি মিশ্র বলেই আমার ধারণা। তাছাড়া গ্রন্থটি প্রচারও লাভ করেনি তেমন। এই সব কারণে বর্তমান উদ্যোগটিতে আমি মনোযোগী হই। এক্ষেত্রে আমার সহায়ক হল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কৃতি ছাত্র শ্রীমান কর্মধন তন্চংগ্যা। তার এবং তার বন্ধুদের সংগ্রহ থেকে তন্চংগ্যা তথা পার্বত্য এলাকার প্রবাদের মধ্যে নিম্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি-

১. গঠন ও ভাবগত দিক থেকে চাকমা প্রবাদের সাথে এর অনেকাংশে মিল বিদ্যমান, যদিও তন্চংগ্যা গঠনে কিছুটা তীব্রতা ও প্রাচীনতাও লক্ষ্য করা যায় যা চাকমার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। যেমন, 'সর্গ ('স্বর্গ') গু খাই দিক্কনে'? বা 'সাপপয়া উলে পুদাই-দ, ব্যাঙয়া উলে ফালাই-দ' ইত্যাদি।

২. বাংলা ভাষার (চট্টগ্রাম সহ) সাথেও এর মিল দূরাগত নয়, যথা-

ক. 'পেলায় পেলায় বাজ্জাবাড়ি খান ৷'
(বাংলায়= "পাতিলে পাতিলে ঠোক্কর লাগেই")
খ. 'পয়ায় ন কানিলে দুধ খায় ন পান / পায় ৷'
(বাংলায়= "পুতে না কান্দলে মাও দুধ দেয় না")
গ. 'মুয়ত জয় মুয়ত খয় ('ক্ষয়')৷'
(বাংলায়= "যেই মুহে ('মুখে') জয় হেই মুহেঐ ('মুখেই') ক্ষয় অয়।")
ঘ. 'পেদৎ বোক মুয়ত লাইত ৷'
(ঢাকা ="পেডে ভুখ থুইয়া মুহে শরম"
চট্টগ্রাম= "প্যেডৎ বোক মুগোৎ / মুয়ৎ লাজ")
ঙ. 'এক্কয়া শিলৎ এক্কয়া কাঁড়া ৷'
(বাংলায়= "নানা মুনির নানা মত / যার ঘরে সে রাজা")
৩. কিছু কিছু প্রবাদে ভাবগত মিলটা খুবই সাধারণ ও নৈকট্যসূচক–
ক. 'খাং খাং মাইনসত্তুন গেয়াহ্ নাই,
দাং দাং মাইনসত্তুন বউত্ নাই ৷'
(বাংলা= "অতি গেরস্থ না পায় ঘর, অতি ঘরণী না পায় বর")
এখানে তন্চংগ্যা প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হল– 'খাই–খাই মানুষের শরীর থাকেনা, পালাই–পালাই মানুষের কোনও বস্তুই থাকেনা'। ইংরেজীতে সম্ভবত এটাকেই বলে -'a rolling stone, gathers no moss,'। এর সমার্থকতার বাংলা প্রবাদটি ভিন্ন গঠনের, যথা– 'যে রহে সে সহে'। কিংবা 'যে চলে সে রহে'।
৪. তন্চংগ্যা প্রবাদ এক বাক্যিক গঠন, দ্বিচরণিক গঠন, ছড়ার গঠন ছাড়াও কখনও কখনও সদর্থক বাক্য ও নঞর্থক বাক্য মিলেও একটি রূপ পায়, যথা– 'যে গাছৎ উদি জানে তারে টেলি ন দিলেও উদি পারে, আর যে ন পারে তারে টেলি দিলেও ন পারে।' এই সব প্রবাদ– উক্তিতে ভাষার বৈচিত্র ও ভিন্নতা থাকলেও সাংস্কৃতিক অবিচ্ছেদ্যতাই প্রমাণিত হয়।
৫. 'ছায়–ল কানত্ ('কান') মন্ত্র বড়ায় দেনা'৷
(বাংলায়= "কথায় কান না দেওয়া")
৬. 'নরম পালে উ–ম কুরাও পুদান'৷
(বাংলায়= "নরম বা দুর্বলকে সবাই ঠকাতে চায়")
৭. 'এক্কয়া কুউরে ('কুকুর') ভাত খালে আর এক্কয়া কুউরে চাই থাই ন পারে'৷
(বাংলা= "একজনের সুখ অন্য জন সহ্য করতে পারে না")
৮. 'মরা বাই-স ('বাঁশ') সমারে জেদা ('জীবিত') বাই-স পুরি যান'৷
(বাংলা= "দোষীর সাথে নির্দোষীরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়")
৯. 'আদে দুরি দুখ টা(আ)না'৷
(বাংলা= "জেনে শুনে কষ্ট / দুঃখ পাওয়া")
১০. 'আওই ন কুড়ে ঘি গলানা'৷
(বাংলা= "নারীর সংস্পর্শে পুরুষের মন নরম হওয়া")
১১. 'আই–স ('হাতি') পুনত কুউরে ভুয়ানা'৷
(বাংলা="শক্তিধরের কাছে দুর্বলের নিষ্ফল আকুতি")
১২. 'আউইনত্ ('আগুন') পানি দেনা'৷
(বাংলা= "চরম সমস্যার সমাধান করা")
১৩. 'আক্কল বাধি অনা'৷
(বাংলা= "স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া")

১৪. 'আলু কুইল্যে গাত্তয়া ('গর্ত') থাই'॥
(বাংলা= "ঘটনা ঘটলে প্রমাণও থাকে")
১৫. 'ইচা শুউনি ('শুটকি') অনা'॥
(বাংলা= "মিশুক হওয়া")
১৬. 'ইহিম কামত্ ফল পানা'॥
(বাংলা= "মনোযোগের কাজে সুফল পাওয়া")
১৭. ইচা ('চিংড়ি') কবালত্ গু'॥
(বাংলা= "অতি চালাকির বোকামি প্রকাশ")
১৮.'উসুনা কুড়ায় ডাক কারানা'॥
(বাংলা= "অসম্ভব ব্যাপার")
১৯.'কুড়া ('মুরগী') লাইত্'॥
(বাংলা="প্রথম অবস্থায় লজ্জা পাওয়া")
২০. 'চিল দরে কুড়া ছ ন পুছানা'॥
(বাংলা= "ক্ষতির আশঙ্কায় ভাল কাজ না করা")
২১. 'সিনডালে-অ লো ('রক্ত') ন নিড়ানা'॥
(বাংলা= "অতি কৃপনতা")
২২. 'মুঅ গুনে ব্যাঙ মরা'॥
(বাংলা= "নিজের দোষে নিজের বিপদ ডেকে আনা")
২৩. 'ঠেঙ(অ) কোইত্ উরি দেনা'॥
(বাংলা= "অসৌজন্যতা")
২৪. 'দ্বি-জন ছেড়ে ছুমানা'॥
(বাংলা= "সুসম্পর্কের ফাটল ধরিয়ে দেওয়া")
২৫. 'পাইত্তে পাইত্তে রাইত্তে পাইত্'॥
(বাংলা= "কান কাজ করতে করতে অভ্যাস হওয়া")
২৬. 'বিচ্যা গরুর দাঁত চাইনে লাভ নাই'॥
(বাংলা= "গৃহিত সিদ্ধান্তের পরে পর্যালোচনা নিষ্প্রয়োজন")
২৭. 'গুউত্তুন মুত্ গম্ অনা'॥
(বাংলা= "আগে খারাপ থেকে বর্তমানে এসে ভাল সাজা")
২৮. 'ঘ-র উন্দুরে বেড়া কামারান'॥
(বাংলা="ঘরের শত্রু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া")
২৯. 'রাঙা কালা মু অনা'॥
(বাংলা= "কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া")
৩০. 'ভুত্তোয়্যা কুউরে রোঙ কারা-না'॥
(বাংলা= "খালি কলসি বাজে বেশি")
৩১. 'গরু-ছাঅল ধড়ে ক্ষেত গিরাদি রাখানা'॥
(বাংলা= "নিজের সম্পদ নিজে যত্ন নেওয়া")
৩২. 'আইডে আইডে ধদাডোদি টিক্ষ্যা (নলখাগড়া) কা(অ)রা গুরি'
(বাংলা="দুই পক্ষ সবলের শক্তি প্রদর্শনের ফলে দূর্বলের ক্ষতি হওয়া")
৩৩. 'দা-শি দিলে নাচি খায়, সবা-ইত্ ন পালে মা-ই খাই'
(বাংলা="প্রথমে দিলে খাই না পরে নিজে খুঁজে খাই")

Scanned with CamScanner

তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রাচীন স্বাধীনরাজ্য

-শ্রীবীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির উৎপত্তির ইতিহাস এযাবত বিতর্কিত এবং কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। এযাবত তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তি সম্পর্কে যেসব তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে, দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে নতুন তথ্য অর্জনের ফলে সেসব তথ্য সমূহের বিতর্ক ও অস্পষ্টতার নিরসন হয়েছে। চাকমা জাতির ইতিহাস লেখকগণ তঞ্চঙ্গ্যা বা দাইনাকগণকে চাকমা জাতিরই একটি শাখা বলে বার বার উল্লেখ করে এসেছেন। আবার কেহ কেহ চাকমা জাতিকে চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা এবং দাইনাক এই তিন শাখায় বিভক্ত বলেও উল্লেখ করে থাকেন। আসলে তঞ্চঙ্গ্যাগণকে মারমা, রাখাইন ও বর্মিরা দাইনাক বলেন। সেই জন্য মায়ানমারে "তঞ্চঙ্গ্যা" নামে কোন জনগোষ্ঠী নেই। অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দাইনাকরা সেখানে অন্যতম (পৃথক) জনগোষ্ঠী বলে স্বীকৃত। বর্তমানে যারা তঞ্চঙ্গ্যা নামে অভিহিত, এককালে দাইনাক পরিচয়ে তারা আরাকান বা মায়ানমার থেকে এতদাঞ্চলে এসেছিল। সেই দাইনাকদেরই এখানে তঞ্চঙ্গ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর যেহেতু তঞ্চঙ্গ্যাগণ তাদের পূর্বেকার পরিচয় দাইনাক নামে মায়ানমার বা আরাকান থেকে এসেছিল, কাজেই তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তির ঐতিহাসিক পটভূমি মায়ানমার বা আরাকানের সূত্র ধরেই অনুসন্ধান করতে হবে।

এতদঅঞ্চলে বিদেশীদের মধ্যে যার লেখায় প্রথম দাইনাকদের সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন কর্ণেল এ পি ফেইরী (১৮৪১), তিনি An account of Arakan নামক নিবন্ধে দাইনাকদের কথা প্রথম উল্লেখ করেন এভাবে– "The remaining hill tribes are Daingnak and the Murung. They both inhabit the upper course of Mayu river. The language of the first is a corrupt Bengali. They call themselves "khein-banago." Of their descent I could learn nothing; probably they may be the offspring of Bengalees carried into hills as slaves, where their physical appearance has been modified by change of climate. In religion they are Buddhist." (Lient phaytere An Account of Arakan, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh ১৮৪১.সূত্রঃ "তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি" প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, তঞ্চঙ্গ্যা মহাসম্মেলন, রাঙামাটি)

রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর প্রাক্তন পরিচালক অশোক কুমার দেওয়ান তাঁর প্রকাশিত "চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার" গ্রন্থে ফেইরীর উপরোক্ত বিবৃতিকে নিম্নলিখিতভাবে মন্তব্য করেছেন। "চাকমাদের একটি দল দৈংনাকেরা (দাইনাক) দীর্ঘকাল পূর্ব থেকে আরাকানে বসবাস করে আসছে। দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় তাদের কথা আমরা

প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তাদের কথা নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় স্যার আর্থার ফেইরী তাঁর ১৮৪১ সালে প্রকাশিত An Account of Arakan নামক নিবন্ধে।

ফেইরী বলেছেন যে, দৈংনাকেরা নিজেদের "খেইমবা-নাগো" বলে পরিচয় দেয়। এই "খেইমবা-নাগো" কথাটির অর্থ কি? খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আরাকানী ভাষায় বা প্রতিবেশী কোন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষায় শব্দটির কোন অর্থ হয় না। সুতরাং আমাদের কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। অনুমান হয় যে, ফেইরীর সঙ্গে আলাপ করার সময় তারা আসলে নিজেদের চম্পকনগরের লোক বলেই পরিচয় দিয়েছিল। ফেইরী সেই সময় ছিলেন লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার একজন তরুণ অফিসার। সেই তরুণ বয়সে তিনি আরাকানী ভাষা আয়ত্ত্ব করেছিলেন বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ কোন আরাকানী দোভাষীর মাধ্যমেই তাঁদের কথাবার্তা চলেছিল। আরাকানী ভাষায় শব্দের শেষে হলন্ত ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয় না। অতএব চম্পকনগর শব্দটির উচ্চারণ আরাকানী দোভাষীর উচ্চারণে "চেইমপানগো" হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ এই চেইমপানগো শব্দটিকে শোনার ভুলে হোক বা নোট করার ভুলে হোক, ফেইরী "খেইমবানাগো" লিখেছেন। এটা নিছক অনুমান। এই অনুমান ছাড়া দৈংনাকেরা নিজেদের "খেইমবানগো" হিসেবে পরিচয় দেওয়ার আর কী অর্থ হতে পারে আমরা ভেবে পাই না। দৈংনাকদের মধ্যে বরাবরই চম্পকনগরের বিজয়গিরির রাজ্যভিযান সম্পর্কিত জনশ্রুতি প্রচলিত এই ধারণার কারণ এই যে, আরাকানবাসী দৈংনাকদেরই প্রত্যাগত তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের প্রতিটি লোকই আজ পর্যন্ত সেই একই বিশ্বাসে গভীরভাবে বিশ্বাসী। দৈংনাকদের সঙ্গে এ অঞ্চলের জনগণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে কম করে হলেও প্রায় ৩০০ বছর।

রাজা বিজয়গিরির নেতৃত্বে চম্পকনগর থেকে দক্ষিণাভিমুখে যুদ্ধ অভিযানে আসার পর তারা আর পূর্ব স্থানে ফিরে না গিয়ে এই অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেছিল। দৈংনাকগণসহ চাকমা তঞ্চঙ্গ্যাদের সে বিশ্বাসের মূলে অবশ্যই ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।

ফেইরী বলেছেন, দৈননাকেরা (দৈংনাকও লেখা হয়) বৌদ্ধ এবং তারা মায়া নদীর (মায়ু) উর্ধ্বভাগে বসবাস করে। তাদের ভাষা বিকৃত বাংলা। তাদের ভাষা বিকৃত বাংলা বিধায় তিনি অনুমান করেন যে, তারা দাসরূপে আনীত বাঙ্গালিদের উত্তর পুরুষ হওয়া সম্ভব। সেখানে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনে দৈহিক গঠন, আকৃতি ও চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে।

ফেইরীর এই অনুমান সঠিক নহে। কেননা জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে কোন জনগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন, আকৃতি ও চেহারার পরিবর্তন কোন দিন সম্ভব হতে পারে না। মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে একই জলবায়ুতে পাশাপাশি শত শত বৎসর বাস করেও কোন বাঙ্গালির (অমঙ্গোলীয়) দৈহিক গঠন, আকৃতি ও চেহারার পরিবর্তন হয়ে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে এমন কোন দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায়নি।

Scanned with CamScanner

চাকমা জাতির ইতিহাস রচয়িতা সতীশচন্দ্র ঘোষ, মাধব চন্দ্র চাকমা কর্মী, বিরাজ মোহন দেওয়ান প্রভৃতি তাঁদের পূর্বসুরী কর্ণেল এ পি ফেইরী (১৮৪১), ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন (১৮৬৯), স্যার রিজলি (১৮৯১) প্রভৃতি এতদাঞ্চলের শাসক ও গবেষক প্রমুখ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে চাকমা জাতির ইতিহাস দাঁড় করিয়েছেন এবং চাকামা জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বহু তথ্য সমাবেশ করেছেন। তাঁদের সকলের একই মত যে, চাকমারা শাক্য বংশীয় এবং তারা চম্পকনগরের অধিবাসী ছিল এককালে।

দাইনাকদের উৎপত্তি সংক্রান্ত যে বিবরণ "চাকমা জাতি" (১৯০৯) ইতিহাস গ্রন্থে সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রদান করেছেন তাতে দেখা যায় যে, ১৩৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে আরাকানাধিপতি (কোন কোন গ্রন্থে ব্রহ্ম সম্রাট) মেঙ্গদি মনিজগিরির (মইচাগিরি) রাজা ইয়ংজকে সুকৌশলে আক্রমণ করলে ইয়ংজ পরাজিত হন এবং দশ সহস্র প্রজাসহ (মতান্তরে সৈন্যসহ) তিনি বন্দী হন। সেই দশ সহস্র প্রজা বা সৈন্যগণকে এংখ্যং বা ইয়ংখ্যং নামক স্থানে বসবাস করার অনুমতি দেয়া হয় এবং তাদের পূর্বতন উপাধি পরিবর্তন করে দাইনাক আখ্যা প্রদান করা হয়। এইভাবেই দাইনাকদের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

আবার চাকমা ঐতিহাসিকগণ উল্লিখিত রাজা ইয়ংজকে চাকমারাজা অরুনযুগ বলে সনাক্ত করেছেন। ফলে দাইনাকগণ চাকমা জাতির একটি অংশ বলে বিশ্বাস করা হয়। আবার দাইনাক ও তঞ্চঙ্গ্যারা যে একই জাতিগোষ্ঠীর লোক, তাই তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তিও চাকমা জাতি হতে ঘটেছে বলে মনে করা হয়। এই তথ্যটিই দাইনাক বা তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তির পটভূমি হিসেবে বরাবরই চাকমা জাতির ইতিহাস রচয়িতাগণ প্রমাণ্য দলিল স্বরূপ উপস্থাপন করে আসছেন। কিন্তু দাইনাকদের উৎপত্তির উল্লিখিত অনুরূপ আর একটি কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায় চাক জাতির উৎপত্তির ক্ষেত্রেও। এ দু'টো কাহিনীর অত্যাচার্য মিল দেখে অশোক কুমার দেওয়ান তাঁর "চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার" (৬৪ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ) গ্রন্থে বলেছেন, "তাহলে দেখা যায় এই যাবৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত চাকমা জাতির ইতিহাসের এই অধ্যায়টি চাক জাতিও নিজেদের বলে দাবী করেছেন। হয়ত এই কারণেই বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান তাঁর চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থে চাকরাও চাকমাদের একটি অংশ বলে দাবী করেছেন। উল্লিখিত রাজা ইয়ংজ আসলেই কি চাকমা রাজা অরুন যুগ? তিনি কি দাইনাক আখ্যাধারীদের রাজা? নাকি চাকদের রাজা?"

রাজা ইয়ংজ যে চাকমা রাজা অরুনযুগ, এর নিশ্চিত প্রমাণের সপক্ষে চাকমা ঐতিহাসিকগণ তেমন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ হাজির করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। নতুবা অশোক কুমার দেওয়ানকে তাঁর চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার গ্রন্থে আক্ষেপ করে বলতে হতো না, "এই কাহিনী কি চাকরা আমাদের কাছ থেকে চুরি করেছে? নাকি আমরা তাদের কাহিনী আমাদের বলে চালিয়ে দিচ্ছি?"

Scanned with CamScanner

অশোক কুমার দেওয়ান আরও উল্লেখ করেছেন যে, আরাকান ইতিহাসে মেংগদির রাজত্বকাল ১২৭৯ খ্রীঃ থেকে ১৩৮৪ খ্রীঃ পর্যন্ত (অবিশ্বাস্যভাবে দীর্ঘ ১০৬ বৎসর)। এই মেংগদির সময়েই দেঙ্গ্যাওয়াদির (দান্যাওয়াদি আরেতবুং–আরাকানের ইতিহাস) বর্ণিত ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দের মেচাগিরি পতনের ঘটনা।

কিন্তু ফেইরীর ব্রহ্ম ইতিহাসে (History of Burma: Page: ৭৬) আরাকানরাজ মেংগদি কর্তৃক সাকরাজ্য জয়ের কোন বিবরণ নেই–বরং মাইন সেইং (Myin Saing) এর শান জাতি কর্তৃক উল্টো আক্রমণেরই উল্লেখ আছে। দুটি পুস্তকে দু' ধরণের সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীত ধর্মী বক্তব্য ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সূত্র পর্যালোচনা করে এই কাহিনী চাকদেরই দাবী করো সহজ বলে অশোক কুমার দেওয়ান মন্তব্য করেন। "বর্তমানে চাক জাতি নানা কিছুর বিচারে উচ্চ ব্রহ্মের কাদু জনগোষ্ঠীর একটি শাখা বলে অনুমিত হয়। সে কারণে চাকদের পক্ষেই সাক পরিচয় দেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং যদিও ইয়ংজ কাহিনীর যথার্থতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে, তবুও সে কাহিনী তাদেরই দাবী করা সহজ"।

স্যার আর্থার ফেইরী (১৮৪১), ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন (১৮৬৯) এবং স্যার রিজলি (১৮৯১) ব্রহ্মদেশ এবং আরাকান গিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করেছিলেন এবং সেই দেশের রাজ্য, সাম্রাজ্য এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে লিখেছিলেন। তাঁদের সেই সব লেখায় দাইনাক সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কাজেই দাইনাক জাতিগোষ্ঠীও একটি পৃথক নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী তা অনায়াসে প্রমাণিত হয়।

প্রাচীন আরাকান ইতিহাস "দান্যাওয়াদি আরে তবুং"– এর মধ্যেই দাইনাক শব্দের পরিচয় নিহিত আছে। শব্দগত বিচারেও দান্যাওয়াদি ও দাইনাককে একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে হয়। দু'টোই বিশেষ্য পদ, একটি নামবাচক বিশেষ্য (অঞ্চলের নাম) এবং অপরটি জাতিবাচক বিশেষ্য (অধিবাসীদের নাম)। নামবাচক (অঞ্চল) বিশেষ্য পদের সাথে জাতিবাচক বিশেষ্য পদের সম্পর্ক চিরকালীন। একটি জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও বিকাশ যে অঞ্চলে ঘটে, সাধারণতঃ সে অঞ্চলের নামানুসারেই সেই জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন–বাংলা ভূখণ্ডে যে জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি বা বসতি ও বিকাশ সাধিত হয়েছে, তারা বাঙ্গালি নামে অভিহিত হয়েছেন।

ড. খিন মং নগুনি গি (Dr. Khin Moung Nguni Gi) তার "হিষ্ট্রোরী অফ মায়ানমার" গ্রন্থে দান্যাওয়াদি অধ্যায়ে যে তথ্যের উপস্থাপনা করেছেন, তাতে দান্যাওয়াদি এবং দাইনাকদের সঙ্গে কপিলাবস্তুর শাক্যবংশের নিবিড় যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে দান্যাওয়াদি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩২৫ অব্দ থেকে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বর্তমান আরাকান ভূখণ্ডে দান্যাওয়াদি তিনটি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দান্যাওয়াদি যিনি প্রতিষ্ঠা

Scanned with CamScanner

করেছিলেন, তাঁর নাম মারায়ু। তিনি কপিলাবস্তুর শাক্য বংশীয় রাজপুত্র ছিলেন। কিছু রাজনৈতিক কারণে তার অনুসারীসহ বর্তমান আরাকান ভূখণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে দান্যাওয়াদি নামক একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি এক শক্তিশালী মুরং (ম্রো) নৃগোষ্ঠী প্রধানের কন্যাকে
বিয়ে করেছিলেন। মারায়ুর পরে তাঁর বংশের আরো ৫৪ জন রাজা দান্যাওয়াদিতে সফলভাবে শাসন করেছিলেন বলে জানা যায়।

দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, উচ্চব্রহ্মের তগুং (Tagaung) রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবিরাজা (Abhiraja)–এর জ্যেষ্ঠপুত্র কংরাজাগ্রী। তগুং রাজ্যের রাজা আবিরাজার মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র কংরাজাগ্রী ও কংরাজাঞ্জী– এর মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায়। যুদ্ধে বড় ভাই কংরাজাগ্রী পরাজিত হন এবং তার অনুসারীসহ দান্যাওয়াদিতে পৌছেন ও দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইতিহাসে দেখা যায়, আবিরাজা উচ্চব্রহ্মে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম দিয়েছিলেন সাংগাচ্ছানাগারা। তিনি কপিলাবস্তুর শাক্য বংশীয় রাজা ছিলেন। একদা কপিলাবস্তুর রাজ্যের সাথে পার্শ্ববর্তী পাঞ্চালা রাজ্যের যুদ্ধ বাঁধে এবং যুদ্ধে কপিলাবস্তুর রাজা আবিরাজা পরাজিত হলে তার অনুসারীসহ তিনি তগুং অঞ্চলে পালিয়ে আসেন এবং সেখানে সাংগাচ্ছানাগারা নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

কংরাজাগ্রী দ্বিতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠার পর অত্যন্ত সফলতার মধ্য দিয়ে দান্যাওয়াদি শাসন করেন। তার মৃত্যুর পর তাঁর বংশীয় আরো ২৮ জন রাজা দান্যাওয়াদি দক্ষতার সাথে শাসন করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। কংরাজাগ্রী বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করে তৃতীয় দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন সুরিয়া (সূর্য) বংশের প্রতিষ্ঠাতা চান্দা সুরিয়া (মতান্তরে চন্দ্র–সূর্য)।

উল্লিখিত দান্যাওয়াদির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম পর্যায়ের দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠিত ও শাসিত হয়েছিল মারায়ু ও তাঁর বংশের রাজাদের দ্বারা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠিত ও শাসিত হয়েছিল আবিরাজার পুত্র কংরাজাগ্রী ও তাঁর বংশধর রাজাদের দ্বারা এবং তৃতীয় পর্যায়ের দান্যাওয়াদি প্রতিষ্ঠিত ও শাসিত হয়েছিল চান্দা সুরিয়া ও তাঁর বংশীয় রাজাদের দ্বারা। তাঁদের সম্মিলিত শাসনকাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩২৫ অব্দ থেকে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তিনটি পর্যায়ের দান্যাওয়াদি নগরী একই স্থানে, নাকি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে ব্যাপারে বার্মা ইতিহাস এখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। তবে মনে করা হয়, তিন বংশের রাজারা নিজেদের সভ্যতায় গড়ে তুলেছিলেন বলে হয়তো একই দান্যাওয়াদির নগরীর তিনটি আমলকে তিনটি পর্যায় বলে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বার্মার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কেবল একটি দান্যাওয়াদির অস্তিত্বই আবিস্কার করতে পেরেছে।

Scanned with CamScanner

আবিস্কৃত দান্যাওয়াদি নগরীর অবস্থান বর্তমান সিত্তোয়ে শহর থেকে কলদান নদী বরাবর ৬০ মাইল উজানে ৬ মাইল পশ্চিমে। খনন কাজের ফলে দেখা গেছে ঐ নগরীটি কলদান নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ছিল। নগরটি ভেতর ও বাহিরের দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। শত্রুর আক্রমণ ও বন্যা থেকে নগরী ও শস্য ক্ষেত্র রক্ষা করার জন্য চতুর্দিকে মাটির দেয়াল-ব্যূহ তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন। এ দান্যাওয়াদিই হচ্ছে আরাকান ভূখণ্ডের প্রাচীনতম নগরী এবং এখানেই গড়ে উঠেছিলো আরাকানের প্রথম সভ্যতা।

দান্যাওয়াদি নগরীর প্রতিষ্ঠাতা এবং দান্যাওয়াদির অধিবাসী দাইনাকদের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস গবেষকদের মধ্যে এরকম বিবরণ পাওয়া যায়। রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক সুপ্রিয় তালুকদার কর্তৃক প্রকাশিত "চম্পক নগরের সন্ধানে: বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি" গ্রন্থে তিনি The Tai and the Tai Kingdom by Padmeswar Gogoi গ্রন্থের ১০৪নং পৃষ্ঠা উল্লেখ করে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত তথ্য বিবরণী প্রদান করেছেন। যা খুবই প্রনিধানযোগ্য। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, ৫৬৮ খ্রিষ্টপূর্বে ভারতের বিহার বা প্রাচীন মগধ হতে চন্দ্র-সূর্য (Canda Suriya) নামক একজন ভারতীয় এক সামন্ত আদিম জড়োপাসক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ চট্টগ্রাম আরাকান অধিকার করত: রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি সেখানকার রাজা হয়েছিলেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল ধন্যাবতী। তিনিই আরাকানে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং আরাকানে মহামুনি বুদ্ধমূর্তি ও মহামুনি প্যাগোডা নির্মাণ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হার্ভে উল্লেখ করেন, " The City of Dhangyawati on the bank of Gaba river now Kaladan in Arakan was raised by the king Aug-dza-na the son of Kapilawat of Magadha and of this race fifty kings reigned over a period of 1800 years. Then came the king Tsandathoorecya, who was not a different dynasty, but in his reign the Boodh Goutoma; having been born in Magadha, visited Arakan. The pious king built the famous temple of Mahamuni, in his honour, this still exists. The ruins of the ancient temple of Mahamuni built entirely of stone, the site of the former cities, shown by the ruins of tanks and ruins of pagodas, the extensive stone walls at the old capital, certainly tell more of flourishing kingdom then what the British found it. (British rule in Burma by Harvey, Vol: 10)

হার্ভে তাঁর প্রদত্ত বিবরণে চান্দা-সুরিয়ার আরাকানে আগমনের পূর্বে কলদান নদী তীরবর্তী দান্যবতী (অনেকে লিখেছেন ধন্যাবতী) নগরীর রাজার নাম Ang-dza-na the son of kapilawat of Magadha উল্লেখ করেছেন। Ang-dza-na আমাদের পূর্ববর্ণিত দান্যাওয়াদি অধ্যায়ের কংরাজাগ্রী বংশেরই শেষ রাজা। কাজেই দেখা যাচ্ছে দান্যাওয়াদির তিন পর্যায় এর

Scanned with CamScanner

অনুক্রমিক ইতিবৃত্ত মিলে যাচ্ছে।

কোন পর্যায়ের দান্যাওয়াদির সাথে দাইনাকদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রাচীন আরাকানে দাইনাকদের বসতি ছিল তা প্রাচীন আরাকান ইতিহাসে পাওয়া যায়। আব্দুল হক চৌধুরী কর্তৃক প্রণীত বাংলা একাডেমী ঢাকা কর্তৃক জানুয়ারী ১৯৯৪ প্রকাশিত "প্রাচীন আরাকান, রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী" গ্রন্থের "আরাকানের জনগোষ্ঠী" নামক অধ্যায়ে দাইনাকদের নাম পাওয়া যায়। যথা– প্রাচীন আরাকান রাজ্য ছিল মোঙ্গল, তিব্বত ব্রহ্ম জনগোষ্ঠী ও মুরং, খুমী, চাক, মিন, সেন্দুজ, ম্রো, খ্যাং, ডইনাক, মারু মিউ প্রভৃতি কিরাত উপজাতি অধ্যুষিত দেশ।

বার্মার রাখাইন ইতিহাসের আলোকেও ধারণা পাওয়া যায় দাইনাকদের উৎপত্তি ঘটেছে বার্মা ভূখণ্ডের আরাকানে অবস্থিত প্রাচীন দান্যাওয়াদিতে। দান্যাওয়াদির অধিবাসী বলে তারা দাইনাক নামে অভিহিত হয়েছেন। প্রাচীন দান্যাওয়াদির সেই অধিবাসীদের উত্তরসুরী দাইনাকদের একটি অংশ কোন এক সময় আরাকন ভূখণ্ড থেকে (তাদের আবাসভূমি থেকে) পার্শ্ববর্তী নাফ নদী অতিক্রম করে, সীমান্ত পার হয়ে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সর্ব দক্ষিণে, বার্মার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। ইতিহাসে দেখা যায়, চট্টগ্রামের সেই অঞ্চলটি বিভিন্ন সময়ে আরাকনের করতলগত ছিল। "পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল প্রায় দেড়শ বছর (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস– মাহবুবুল আলম, পৃষ্ঠাঃ ৭৭)।

এছাড়াও এ অঞ্চলটি তৎকালীন দান্যাওয়াদির সন্নিকট ও ভূ-প্রকৃতিগতভাবে প্রায় সমরূপ অঞ্চল বিধায় সুদূর অতীতকাল হতে বার্মা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে দাইনাকদের বসবাস শুরু হতে পারে। এতদাঞ্চলে এসে মাতামুহুরী নদীর আদরের তৈনগাঙ (মারমারা বলেন তৈনছং) তাদের সর্বপ্রথম বসতি গড়ে ওঠে বলে জনশ্রুতি আছে। কালক্রমে তারা সেখান থেকে পশ্চিম ও উত্তর দিকে বিস্তার লাভ করে এবং তৈনছং এর অধিবাসী বলে তৈনছংগা (তঞ্চঙ্গ্যা) নামে সবাই ডাকতে আরম্ভ করে এভাবেই তারা তঞ্চঙ্গ্যা নামে পরিচিত হয়ে উঠে। তবে মার্মা, রাখাইন এবং বর্মীরা এখনো তাদের দাইনাক নামেই ডাকে।

দাইনাকদের মূল ভূখন্ড আরাকান বা ব্রহ্মদেশ থেকে এতদাঞ্চলে কিভাবে আগমন ঘটল সেই সম্পর্কে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। ইহা অবশ্য উত্তর ব্রহ্মে অবস্থানকালে দাইনাকদের মধ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। একদিন মংসুই ও অংসুই নামে সহোদর দুই ভ্রাতা (দুই দলের দুই দলপতি) সেই দেশের অক্স্রা (বার্মা) রাজার অত্যাচর থেকে মুক্ত থাকতে পারবে এমন একটি শান্তিপূর্ণ দেশের অনুসন্ধানে দলবল নিয়ে বহির্গত হল। কয়েকদিন চলার পর একসময় এক বিশাল বনাঞ্চলে পৌঁছে বিশ্রামের জন্য থামল উভয় দল। মংসুই-এর লোকেরা ছোট ছড়া থেকে ছোট ছোট চিংড়ি (ইছা মাছ) মাছ ধরে রান্না করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করল। ছোট ভাই অংসুই-এর লোকেরা নদী থেকে বড় বড় চিংড়ি মাছ ধরে আনে। সেসব রান্না করার সময়

অংসুই লাল চিংড়িগুলো দেখে মনে করল চিংড়িগুলোতে রক্ত অধিক থাকায় সিদ্ধ হচ্ছে না। কেননা সিদ্ধ হলেই চিংড়িগুলো সাদা হয়ে যাবে। তাই যাতে চিংড়িগুলো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে সাদা হয়ে যায়, চুলায় আলো লাকড়ি দিয়ে দীর্ঘক্ষণ রান্না করার জন্য তার লোকদের আদেশ করল।তাদের এই বিলম্ব দেখে মংসুই তার দলবল নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হল এবং তার ছোটভাই অংসুইকে ডেকে বলল, "আমাদের বনাঞ্চল ফেলে অনেকদূর যেতে হবে, এখন রওয়ানা না দিলে রাত্রি হবার আগে এই বনাঞ্চল অতিক্রম করতে পারব না। আমরা অগ্রসর হচ্ছি। তোমরা তোমাদের সময় হলে রওয়ানা দিও। আমরা যেই পথে অগ্রসর হই কলাগাছ কেটে চিহ্ন রেখে যাব, তোমরা সেই চিহ্ন দেখে আমাদের অনুসরণ করিও।" এই বলে তারা চলে গেল। দীর্ঘক্ষণ চিংড়ি মাছ রান্না করে অংসুই এর লোকেরা ভাত খেতে খেতে রাত হয়ে গেল। রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি হল। ফলে মংসুই এর লোকেরা যাবার পথে যে কলাগাছ কেটে গেছে, সেই কলাগাছের আগায় 'ডিগ' (নতুন পাতা) উঠে বেশ লম্বা হয়েছে। সেসব দেখে অংসুই এবং তার লোকেরা ভাবল, অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, মংসুই এর দলকে তারা নাগাল পাবে না। তাই তারা বনের অন্য প্রান্তে গিয়ে পুনরায় পূর্বেকার জায়গায় ছড়িয়ে গেল এবং অন্য কোথাও বিস্তৃত হয়ে গেল।

জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায়, এই মংসুইকে চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যারা (দাইনাক) মইসাং রাজা বলে। দান্যাওয়াদি আরেতবুং-এ বলা হয়েছে মংসোয়ে। মংসোয়ের পুত্র মারেক্যজ হচ্ছে আরাকান ত্যাগী পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম প্রবেশকারী সাক (কি চাকমা?) দলের নেতা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর আরাকানের সাকদের একটি দল চট্টগ্রামের বড়ুয়াদের (বাঙ্গালী বৌদ্ধ) সঙ্গে একত্রিত হয় এবং আরাকান রাজ্যের অরাজকতার সুযোগে কলদান নদীর উজানে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করে। দাইনাকেরাও সাক এবং বাঙ্গালী বৌদ্ধদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়। এই সংঘবদ্ধ তিনটি দল অক্সা (বার্মা) রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায়। কিন্তু অক্সা রাজার কাছে তারা পরাজিত হয় এবং তাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার নেমে আসে। অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনেকেই আরাকান ত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে আসে। তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায়, সেই সকল লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে মাতামুহুরী অববাহিকায় প্রথম প্রবেশ করে তারা সাপ্রেই (সাপ্রেই)। উল্লেখ্য যে, তঞ্চঙ্গ্যাদের ধন্যাগসা মেলংগসা, লাংগসা লোকদিগকে এখনো সাপ্রেই বলা হয়।

১৪১৮ সালে সাপ্রেই গোত্রীয়সহ আরাকান থেকে একদল লোক গভীর জঙ্গল অতিক্রম করে আলিকদমে প্রবেশ করে। সেই সময় চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন জামাল-উদ্দিন। তিনি আরাকন থেকে আগত লোকজনকে মাতামুহুরী অববাহিকায় বারটি গ্রামে বসবাস করার অনুমতি প্রদান করেন।

ঐ বারটি গ্রামকে বার তালুক নামে অভিহিত করা হয়। আবার এই বার তালুক দাইনাকদের বার গসা'র (গোঝা) নামে নামকরণ করা হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে তাদের সর্বপ্রথম

Scanned with CamScanner

বসতি স্থান হচ্ছে মাতামুহুরী নদীর আদরের উপনদী তৈনছং (মারমারা তৈনছং বলেন) বা তৈনছড়ি। এই তৈনছড়ি নামের তাদের বসতি স্থানের নাম হতেই তাদের তৈনছংগ্যা (তঞ্চঙ্গ্যা) নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়েছে। তবে মারমা, রাখাইন ও বর্মীদের কাছে তঞ্চঙ্গ্যারা এখনো দাইনাক নামেই পরিচিত। দান্যাওয়াদির দাইনাকেরা এভাবে তৈনছং এর অধিবাসী বলে "তঞ্চঙ্গ্যা" নামে পরিচিত হয়ে গেল।

পঞ্চদশ হতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যাগণ আলিকদম বা মাতামুহুরী অববাহিকা থেকে পশ্চিম দিকে বিস্তার লাভ করে। কেহ কেহ দক্ষিণে নাক্ষ্যংছড়ি, উখিয়া, টেকনাফ গিয়ে থিতু হয়। অধিকাংশ ক্রমে ক্রমে শঙ্খ নদীর অববাহিকা এবং চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। বর্তমানে বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয় থানা, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাইনছং (রাইংখ্যং), রাজস্থলী ওয়াগ্গা, রাঙ্গামাটি সদর প্রভৃতি অঞ্চলে তারা বসবাস করছে। জুরাছড়ি উপজেলার দুমদুম্যাতেও তাদের বসতি আছে। জনশ্রুতি আছে, এদেশে দাইনাকদের দ্বিতীয় বারের মত ১৮১৯ সালে আগমন ঘটে। আরাকান হতে ৪০০০ তঞ্চঙ্গ্যা তাদের দলপতি ফ্যাপ্রুর নেতৃত্বে রাজা ধরম বক্স খাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তারা চাঁদা সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম শহরে পুর্তগীজ বণিকদের থেকে একটি কুঠি বাড়ি ক্রয় করে রাজা ধরম বক্স খাঁকে শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ উপহার প্রদান করেন। কিন্তু ৪০০০ তঞ্চঙ্গ্যা তাদের দলপতি ফ্যাপ্রুকে দলপতি মেনে নেবার জন্য রাজা ধরম বক্স খাঁর নিকট আবেদন করলে রাজা ধরম বক্স খাঁ তাদের দাবী না মানায় তাদের মধ্য থেকে অনেকেই আরাকানে ফিরে যায়। রাজা ধরম বক্স খাঁকে উপহার প্রদত্ত কুঠি বাড়ি এখন কমিশনারের বাংলো রূপে টিকে আছে।

দাইনাক বা তঞ্চঙ্গ্যাদের বর্তমান বসতি স্থানসমূহের দিকে লক্ষ্য করলে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, তারা দীর্ঘকাল আগে থেকেই তাদের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। বার্মার ইতিহাস– দান্যাওয়াদি আরে তবুং বা আরাকান ইতিহাস (অনেকে লিখেন দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং) অনুসারে এবং নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, তঞ্চঙ্গ্যাগণ দাইনাক পরিচয়ে দান্যাওয়াদির (আরাকান) মূল অধিবাসী ছিল।

Scanned with CamScanner

পার্বত্য অঞ্চলে থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশে তঞ্চঙ্গ্যাদের অবদান।

শ্রীমৎ ড. জিন বোধি ভিক্ষু

চৈত্যভূমি চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের স্বল্প সংখ্যা বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীদের নিয়ে অবিভক্ত বাংলার বৌদ্ধ সমাজ গঠিত। এই বৌদ্ধ সমাজের জন্যই বাংলায় তথা ভারত বৌদ্ধ ধর্মের শিখা নিঃশেষের নির্বাপতি হয় নাই, বৌদ্ধত্বের ধারা বিলুপ্ত হয় নাই। তা নির্বানোন্মুখ দীপ শিখার মত ক্ষীণ হয়েও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের বুকে বৌদ্ধ ধর্মের বিজয় কেতন উড্ডীন রয়েছে। বঙ্গ দেশের চট্টগ্রাম জেলায় বাঙ্গালি বৌদ্ধদের বসবাস কিন্তু পার্বত্য বৌদ্ধরাও এক সময়ে চট্টগ্রামের কয়েক এলাকায় দীর্ঘকাল ছিলেন। কালের বিবর্তনে তারা ক্রমান্বয়ে সমতল ভূমি ছেড়ে পাহাড়ী এলাকায় চলে যায়। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের মধ্যে মোট বারটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী বা জাতিসত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন (১) চাক্‌মা (২) মারমা (৩) ত্রিপুরা (৪) তঞ্চঙ্গ্যা (৫) ম্রো (৬) বম, (৭) উচই (৮) পাংখোয়া (৯) খিয়াং (১০) খুমী (১১) লুসাই এবং (১২) চাক। এরা সবাই স্থানীয় বৌদ্ধ নামে পরিচয় হলেও কিছু কিছু হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে দেখা যায়। এত সব সত্ত্বেও পার্বত্য জনগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বারটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর প্রভাব প্রতিপত্তি তুলনামূলক একটু বেশি। শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় চেতনায় এই দু'জনগোষ্ঠীর পরিচিতির ব্যাপকতা দেখা যায়। চাকমারা- তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়কে চাকমা জাতির একটি শাখা মনে করলেও তঞ্চঙ্গ্যাদিগকেই তারা মূল বা আসল চাকমা বলেও স্বীকার করেন। বর্তমানে দৈংনাক, তৈনটংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যাকে তঞ্চঙ্গ্যা নামধেয় একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকেই উপরোক্ত তিন নামে নির্দেশ করা হয়েছে। যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ এবং ভারতে তৈনচংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যা নামে পরিচিত এবং আরাকান তথা মায়ানমারে দৈংনাক নাম পরিচিত। বঙ্গ দেশে যে সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে-তঞ্চঙ্গ্যা হচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানাধীন রইস্যাবিলি এলাকায়, কক্সবাজার জেলায় উখিয়া ও টেকনাফে তঞ্চঙ্গ্যাদের বসবাস। তাছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা, অরুনাচল, মিজোরাম ও মুনিপুরের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে তঞ্চঙ্গ্যাদের বসবাস আছে। আরাকান তথা মায়ানমারেরই তঞ্চঙ্গ্যাদের সংখ্যা সমধিক। তঞ্চঙ্গ্যাদের সর্বমোট জনসংখ্যা চারি লক্ষাধিক বলে জানা যায়।

আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য আদিবাসী মংগোলীয় জনগোষ্ঠীর ন্যায় তঞ্চঙ্গ্যাগণও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার (মংগোলীয়) জনগোষ্ঠীর দলভূক্ত। তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ভারতীয় আর্যভাষা অন্তর্গত পালি, প্রাকৃত সম্ভূত, বাংলাভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির পার্থক্য হেতু একই জনগোষ্ঠীর লোককে পৃথক পৃথক সত্ত্বার অধিকারী বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর অগ্রসর আদিবাসীর ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। পার্বত্য সমগোত্রীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় অআদিবাসী এমনকি বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর সাথে তঞ্চঙ্গ্যাগণ দীর্ঘকাল সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশে তঞ্চঙ্গ্যাদের অবদান সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস।

চৈত্যভূমি চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। এরই প্রভাব পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত জন সাধারণকেও সমানভাবে প্রভাবিত করে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তারাও স্মরণাতীত কাল থেকে বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী ছিলেন। প্রাচীনকালে ভারতে এবং মায়ানমার অবস্থানকালীন সময়ে তাঁরা প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্বানুভব করতেন।

১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মোগলদের হাতে আরাকান রাজা পরাজিত হলে চট্টগ্রামের রাজত্ব স্থায়ীভাবে মোগল সম্রাটদের হাতে চলে যায়। মুসলিম অধিকারের পর থেকে চট্টগ্রাম তথা পার্বত্যবাসীদের বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় ভাবাদর্শ সমূহ অনেক ধ্বংস হতে থাকে। এক সময় ভারতবর্ষ হতে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদের যে অংশ চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল তা ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে একের পর এক বিভিন্ন আঘাতে বিলুপ্ত হতে বসেছিল। সেই অন্ধকার যুগে বৌদ্ধরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারে ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত ছিল। আত্মত্যাগী মহান ভিক্ষু সংঘ ও বৌদ্ধ বিহার বিলুপ্তিতে বৌদ্ধরা ভুলে যায় প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতি ও দৈনন্দিন আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

ক্রমে এক সময় বৌদ্ধরা ভুলে যায় বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম ও বিষয় থের ধর্ম। ভুলে যায় মহাযান সহ যাবতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য বা সংস্কার। শুধুমাত্র রয়ে গিয়েছিল এক টুকরো গেরুয়া বসন। তা দিয়েই তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও পূজা পার্বন সম্পাদন করত। তখন তাদের রাউলী নামে ডাকা হত। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার লেখায় উল্লেখ করেছেন- "বাংলার অর্ধেক মুসলমান হয়ে গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হল আর বৌদ্ধদের মধ্যে যারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হতেই তাদের উপরে নির্যাতন উপস্থিত হল। মুসলমান অধিকারের পর নতুন সমাজে যারা অনাচারীয় হল, বৌদ্ধধর্ম তাদের মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে পড়ল এবং তারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ব ভুলে গেল এবং ভুলে গেলে শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও করুনাবাদ, তখন রইল জনাকযেক মুর্খ ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তারা অপরাপর মত করে বৌদ্ধধর্ম গড়ে নিল"। (বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম রচনা সংগ্রহ, ৩য় খন্ড পৃ:৩৯৪)

এ সময় বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে 'মঘাখমুর্জা' নামক এক প্রকার ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে রাউলীগণ ধর্মীয় কাজ পরিচালনা করতেন (চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম-ভিক্ষু শীলা চার শাস্ত্রী, পৃ:২০)। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিয়ের ঘটকালি থেকে যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতেন এবং ভিক্ষাপাত্র

Scanned with CamScanner

পিণ্ডাচরণ, পবিত্র ভিক্ষু পরিবাস প্রত ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিলনা (চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রাগুপ্ত: পৃ:২৫), অন্যদিকে বৌদ্ধ গৃহী সমাজে কালিপূজা, দুর্গাপূজা, মনসাপূজা, কার্ত্তিকপূজা, শনিপূজা ইত্যাদি হিন্দু ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত ছিল। আবার মুসলমানদের মানিকপুরের সিন্নি, সত্যপীরের সিন্নী, বদর সাহেবের সিন্নী, সিজির সিন্নী ইত্যাদি অনুষ্ঠানও বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ গৃহীরা তখন এরূপ অবৌদ্ধ সম্মত অবস্থার মধ্যে না হিন্দু না বৌদ্ধ না মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করেছিলেন।

১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বগিড় ও ব্রিটিশ পক্ষের মধ্যে 'য্যান্ডেরো সন্ধির' ফলে আরাকান ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা সরকারের অধীনস্থ হয়। তখন এ সময় আরাকান ও বাংলাদেশ একই সরকার শাসিত হওয়ার এবং যাতায়াতের সুবিধা থাকায় আরাকানীরা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আগমন করতেন। এ সময় আরাকানী থেরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মাঝে মধ্যে চট্টগ্রামের দক্ষিণ ও উত্তরে আরাকানী বংশোদ্ভুত বোমাং ও মান সম্প্রদায়ভূক্ত বৌদ্ধদের নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্ম প্রচার করতেন। তখন বড়ুয়া ও চাকমা সমাজের ধর্মগুরু ছিলেন তখনকার তান্ত্রিক রাউলী সম্প্রদায়। আরাকানী থেরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংস্পর্শে এসে রাউলী পুরোহিত পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার অনুষ্ঠানের কিছু পরিবর্তন হলেও উপসম্পদার বয়স ও ধর্ম বিনয় সম্পর্কে তখনও তাদের কোন ধারণা ছিল না। তারা বিকেলে ভাত ব্যতীত অন্য পানাহার করতেন।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদের যখন এ অবস্থা চলছিল এমন সময় এদেশে দক্ষিণ চট্টগ্রামের হারাবাং এলাকায় বরেণ্য পুণ্য পুরুষ থেরবাদী মূল ধারার প্রাপ্ত ভিক্ষু সারমেধ মহাস্থবিরের আগমন ঘটে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। বঙ্গীয় বৌদ্ধ ও পার্বত্য বৌদ্ধদের মোহ মুক্তির শতাব্দী হিসেবে প্রতিভাত হয়। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের চৈত্র মাসে জ্ঞান তাপস সারমেধ মহাস্থবির সশিষ্য তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক সিতাকুণ্ড আগমন করেন। তখন বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের পুণ্যপুরুষ প্রখ্যাত সংঘমনীষী শ্রীমৎ রাধাচরণ মহাস্থবিরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে, মহা পণ্ডিত শ্রীমৎ সারমেধ মহাস্থবির সদলবলে রাধাচরণ মহাস্থবিরের সাথে সীতাকুণ্ড হতে চক্রসালা হয়ে, বৈদ্যপাড়া শাক্যমুনি বিহার, ঠেগরপুনি বুড়াগোঁসাই মন্দির হয়ে রাউজান মহামুনি মেলায় উপনীত হন। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তীতে মহামুনি মেলা ও মহামুনি মন্দির তখন থেকে বাঙ্গালি বড়ুয়া, পার্বত্য এলাকার চাকমা, বোমাং, মগ, তঞ্চঙ্গ্যাসহ সকল বৌদ্ধদের একটি মিলন তীর্থ ছিল। এ মহাসমাবেশে তিনি বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ও ধর্ম বিনয় বিষয়ে আলোচনা করতেন। অসংখ্য ধর্মানুরাগী ভক্ত পূজারীবৃন্দ তাঁর অমৃতময় ধর্মবাণী শ্রবনে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রাউলী পুরোহিত নামে পরিচিত ধর্মীয় গুরুরা তাঁর সান্নিধ্যে বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম বিনয় সম্পর্কে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনেকটা সংশোধনের পথটা বেছে নেন। তখন থেকে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসীদের মধ্যে নতুন করে ধর্মীয় জাগরণ দেখা দেয়। তিনি ক্রমাগত দু'বছর অবস্থান করে তৎকালীন বৌদ্ধদের মধ্যে

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন কুসংস্কার, অন্ধ ভক্তি, বিশেষতঃ মহাযান পন্থী তান্ত্রিক মতের অসারতা, দেবদেবীর পূজা, পশুবলি, মিথ্যা দৃষ্টি ইত্যাদি যে অবৌদ্ধ উচিত কার্যকলাপ তা সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেন এবং থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের মৌলিক রীতিনীতি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা তুলে ধরেন।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে রাঙ্গুনীয়া রাজবাড়ী রাজানগরে রাজকীয় পুন্যাহ উপলক্ষে চাকমা সার্কেলের রাজামাতা রানী কালিন্দী মহাপন্ডিত শ্রীমৎ সারমেধ মহাস্থবিরের চট্টগ্রামে আগমন, বুদ্ধের ও সধর্মবাণীর প্রচারের শুভ সংবাদ শুনে তাকে আমন্ত্রণ পূর্বক রাজবাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তখন রাজ পরিবারের সকল সদস্য ও জনগণ তাঁর মুখ নিঃশ্রিত ধর্ম বাণী শ্রবনে মুগ্ধ হন। তাঁর সম্মানে রাণী আরাকানী ভাষায় উপাধিযুক্ত সীলমোহর প্রদান করেন। তার নিকট বৌদ্ধ ধর্মে নতুন করে দীক্ষিত হয়ে আরেক নব ইতিহাসের শুভ সূচনা করে সমগ্র পার্বত্য বাসীদের মধ্যে বিরাট সাড়া জাগায়। আরো উল্লেখ্য যে, ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বাঙ্গালী বৌদ্ধদের সাতজন রাউলী পুরোহিতদেরকে ভিত্তি করে সর্ব প্রথম বিনয় সম্মত থেরবাদী আদর্শে হাঞ্চার ঘোনার উপক সীমায় মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের নেতৃত্বে পুনরায় শুভ উপসম্পদা প্রদান করা হয় যা বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজের ইতিহাসে নতুন করে আবার বৌদ্ধ ধর্মের গোড়া পত্তন করা হয়। তারা হলেন (১) পাহাড়তলী গ্রামের শ্রদ্ধেয় জ্ঞানলঙ্কার মহাস্থবির, (২) ধর্ম পুরের হরি মহাস্থবির (৩) মির্জাপুরের সুবর্ণ মহাস্থবির, (৪)গুমান-মর্দনের দুর্রাজ মহাস্থবির, (৫) বিনাজুরীর হরি মহাস্থবির, (৬) পাহাড়তলীর কমল ঠাকুর, এবং (৭) দমদমার অভয়চরণ মহাস্থবির। এদের আত্মত্যাগ এবং ধর্মীয় ভাবাদর্শে সমগ্র চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজের প্রতিথ যশা মহান ভিক্ষু সংঘের প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্মীয় জাগরণটা তড়ান্বিত হয়।

পার্বত্য এলাকার তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীরা ধর্মীয় দিক দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও সনাতন প্রথা মতে এদের অনেকে গাঙপূজা, ভূত পূজা, চুমুলাঙ পূজা, মিত্তিনী পূজা, লক্ষীপূজা, কে পূজা, বুর পারা ইত্যাদির দেব-দেবীর পূজা করতে দেখা যায়। অবশ্য উপরোক্ত পূজা সমূহ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে করা হয় না। ঐসব পূজা কেবলমাত্র দেবদেবীর সন্তুষ্টি বিধান করে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত পূজা সমূহ সম্পাদনের জন্য সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে তাদেরকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বৈদ্য বলা হয় (তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি-শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা। ১৯৯৫ পৃঃ৫২)।

ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান এক নহে। কারণ সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বৈষয়িক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল অপর দিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। ধর্মীয় চেতনায় ধীরে ধীরে গাঢ় হলে সেই চেতনাকে লালন করে প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সংস্কার সাধিত হয় এমন কি কুসংস্কার বলে সমাজ থেকে আস্তে আস্তে বিদায় দেয়া হয়। যে ধর্ম মানুষকে ধারণ করে, সমাজকে ধারণ করে সুন্দর ও মহান করে তোলে, আদি মধ্য ও অন্তে কল্যাণ এনে দেয় সেই বৌদ্ধধর্মই তঞ্চঙ্গ্যাদের ধর্ম। কাজেই বুদ্ধপূজা, সংঘদান, সূত্রশ্রবণ, অষ্ট পরিষ্কার দান, প্রবারণা পূর্নিমা, কঠিন চীবরদান, মাঘী পূর্ণিমায় বহুচক্র মেলা

Scanned with CamScanner

ফালগুনী পূর্ণিমায় জ্ঞাতি সম্মেলন প্রভৃতি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে উৎসব করা হয়ে থাকে। অধুনা লাভী শ্রেষ্ঠ অরহত সীবলী মহাস্থবিরের পূজাও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সম্পন্ন করা হয়। তঞ্চঙ্গাদের প্রত্যেক গ্রামে মনোরম ক্যাং বা বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় (তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতিঃ প্রাগুপ্ত পৃঃ ৫৫)।

তঞ্চঙ্গ্যারা প্রধানত কৃষি নির্ভর হলেও ইদানিং শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে অনেকটা অগ্রগতি লাভ করেছে। ধর্মীয় চেতনার দিক থেকে তারা বর্তমান অনেকটা উন্নত এবং অতীতের অনেক কুসংস্কার মুক্ত বলা যায়। তারা পরিশ্রমী, অধ্যাবসায়, কষ্টসহিষ্ণু, আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল, ধৈর্যশীল, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বন্ধুবৎসল এবং কর্মে একনিষ্ঠ বলেই দ্রুত অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এর মূলে ভিক্ষু সংঘ এবং গৃহীসংঘের সম্মিলিত প্রয়াস ছিল অতুলনীয়। বর্তমান তঞ্চঙ্গ্যাগণ আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি, বৃত্তি মূলক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আইন, প্রশাসন, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন এটা জাতির জন্য শুভ সংবাদ বলা যায়।

ধর্মীয় সামাজিক ও আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতিতে তাদের অবদান ছিল সর্বাগ্রে। তাদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারাণা তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করি। পার্বত্য এলাকায় সদ্ধর্মের পুনরুত্থান শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝা-মাঝি কাল হতে। প্রথমতঃ রাজকীয় প্রভাব, দ্বিতীয়তঃ আত্মত্যাগী ধর্মীয় গুরুদের প্রভাব এবং সাধারণ গৃহীদের আত্মসচেতনতা। বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুরাগ আজ অতটুকু অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি বলা যায়।

ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়- শ্রীমৎ বরমিত্র ভিক্ষু চাকমা সমাজ হতে চাকমা রাজা হরিল চন্দ্র'র (১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) রাজগুরুর আসন অলংকৃত করেন। এরপর শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু, শ্রীমৎ কালাচোখা ঠাকুর (জ্ঞানরত্ন ভিক্ষু), শ্রীমৎ পালক ধন ভিক্ষু এবং শ্রীমৎ প্রিয়রত্ন মহাস্থবিরের প্রমূখ সাংঘিক ব্যক্তিত্বদের প্রচুর খ্যাতি রেখেছিলেন। তাদের সঙ্গে সহায়ক হিসেবে যাদের অবদান ছিল তাঁরা হলেন রাজগুরু অধ্যাপক শ্রীমৎ ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির রাজগুরু, শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির এবং দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, উপ-সংঘরাজ শ্রীমৎ সুগতবংশ মহাস্থবির অন্যতম।

বিংশ শতাব্দির শ্রীমৎ বিমলানন্দ মহাস্থবির আগরতারা অনুবাদ করার কঠিন কাজে হাত দিয়েছিলেন কিন্তু আশানুরূপ সফল হতে না পারলেও ঐ সময় কালে তার অবদান কোন অংশে কম ছিল না। এরই মধ্যে তাদের অর্ধকর্ষিত ভূমিতে জ্ঞানের মশাল এবং ধর্মীয় ধ্বজা নিয়ে নামলেন পার্বত্য এলাকার প্রবাদ প্রতীম সংঘ মনীষী রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির। তিনি ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় দশ বৎসর যাবৎ বার্মা দেশে বুদ্ধের ধর্ম বিনয় এবং ত্রিপিটক বৌদ্ধ সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করে ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসঙ্গতির করণীয় দায়িত্ব শেষ করে জন্ম ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনিই একমাত্র বৌদ্ধ মনিষী যিনি এই মহাসংগীতিকারকে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্থান থেকে এই মহতি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর এই অমূল্য অবদানের জন্য মহাসংগীতি আয়োজন কমিটি তাকে 'অগগ মহাপণ্ডিত' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ২০০৪ সালে মায়ানমার সরকার কর্তৃক 'অগ্গমহাসধোম্মজ্যোতিকাধ্বজ' উপাধি ভূষিত হন। এই সব উপাধি আমাদের বৌদ্ধ সমাজের জন্য বিরল। ত্রিদিব রায় তাঁকে রাজগুরুর পদে বরণ করে নেন। আর তিনি পার্বত্য জাতির মধ্যে সদ্ধর্মের আলো তুলে দিতে আত্মোৎসর্গ করলেন

Scanned with CamScanner

নিজেকে। তাঁর বাল্য জীবনের পথ পরিবর্তনে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ছিলেন তাঁরা রাঙ্গুনীয়া ঘাটচেক গ্রামের সাংঘিক পুরোধা শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবির এবং সাধক পুরুষ শ্রীমৎ আনন্দিত মিত্র মহাস্থবির। তৎকালীন বার্মাদেশ থেকে ত্রিপিটক শাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন কম গৌরবের বিষয় নয়। তিনি তঞ্চঙ্গ্যা জাতির বরেণ্য এবং আলোকিত গর্বিত রত্ন সন্তান। তারই পাশাপাশি ছিলেন উপ-সংঘরাজ শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির। যার আন্তরিক সহযোগিতায় অনেক ভিক্ষু শ্রামন আধুনিক শিক্ষার আলো পেয়ে সমাজ ও ধর্মের উন্নয়নে অনেকে কাজ করে চলেছেন। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির প্রথম কর্মসূচীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিক্ষু সমিতি এবং পার্বত্য চট্টল ভিক্ষু সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ভিক্ষু এবং গৃহী সমাজকে একত্রিত করে স্বজাতির সামগ্রিক কল্যাণে হাত দিয়ে আজ সমগ্র জাতি এর সুফল ভোগ করে চলেছে। তিনি প্রায় ৬টির অধিক বাংলা, চাকমা ও ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে সমাজকে উপহার দিয়েছেন। সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় জাগরণে তাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে অগ্রনী। তাঁরই পাশাপাশি তাঁদের আগে পূণ্য পুরুষ শ্রীমৎ তিষ্য মহাস্থবিরের নাম জানা যায়। যিনি রাজগুরু অগ্রবংশে গুরু ছিলেন। অত্র এলাকায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তিনি পরিচালনা করতেন। তিনি প্রাচীন ধর্মীয় গুরুদের মধ্যে অন্যতম ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। বুদ্ধশাসনে আরেক পুণ্য পুরুষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনা নন্দ মহাস্থবিরকে উপাসম্পাদা দীক্ষা দেন রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির। তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর সংঘপুরোধাদের মধ্যে যাঁদের অবদান চির স্মরণীয় তাঁরা হলেন ভদন্ত আচারনন্দ মহাস্থবির (১৯৩৭-২০০৫), যিনি বৌদ্ধ দেশ-শ্রীলঙ্কায় দীর্ঘকাল ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে সমাজ ও স্বধর্ম সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ধুতাঙ্গ ব্রতধারী শাস্ত্র পণ্ডিত শ্রীমৎ ক্ষেমাঙ্কর মহাস্থবির- গৃহীনাম তেজেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা প্রতিরূপ দেশ বার্মায় গিয়ে ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন পূবক স্বদেশে এসে সদ্ধর্মের উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে কীর্তিময় কাজ হলো ত্রিপিটক শাস্ত্রের অভিধর্ম পিটকের গভীরত্ব বিষয়ক কয়েক গ্রন্থ অনুবাদ করেন যা অত্যন্ত জটিল বিষয়। তন্মধ্যে (১) শাতিকাধাতু-কথা স্বরূপিনী (১৯৯৯) (২) অভিধর্মাথ সংগ্রহ স্বরুপিনী (১৯৯৩)- (৩) যমক স্বরুপিনী (২০০০), (৪) অভিধর্ম পিটকের বিভঙ্গ প্রকরণ (২০০৩) (৫) বুদ্ধ প্রকাশনী (২০০১), (৬) পথ প্রদর্শন (১৯৯৮) (৭) চলার পথে (২০০০) তাছাড়াও তিনি বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা সংস্কার ও সংরক্ষণ করে সামাজিকভাবে অনেক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ওয়াগ্গা জন কল্যাণ বৌদ্ধ বিহারের পরলোকগত আগ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন।

শ্রীমৎ শান্ত জ্যোতি মহাস্থবির ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে চাকমা ভিক্ষু শ্রীমৎ জিতানন্দ মহাস্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হয়ে সেই বছরই পাঁচ মাস পরে রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে শুভ উপসম্পাদা গ্রহণ করেন। সেই থেকে দীর্ঘ একুশ বছর রাজস্থলী মৈত্রী বিহারের অধ্যক্ষ পদে নিষ্ঠার সাথে যাবতীয় ধর্মীয় কার্যাদি পরিচালনা করে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাছাড়া ভিক্ষু সমিতি ও অনাথালয়ের দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি তঞ্চঙ্গ্যাদের একজন বরেণ্য ভিক্ষু ছিলেন।

শ্রীমৎ আর্যানন্দ মহাস্থবির একজন কর্মবীর এবং তঞ্চঙ্গ্যা বংশের কৃতি ভিক্ষু ছিলেন, তিনি অত্র সমাজ ও সদ্ধর্মের কল্যাণে বহু সেবামূলক সংস্থার জন্ম দেন। যথাক্রমে (১) আর্যানন্দ পালি কলেজ (স্থাপিত ১৯৯২) (২) রাঙ্গুনীয়া অগ্রবংশ বংশ শিশু সদনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (৩)

Scanned with CamScanner

ত্রিরত্ন ভিক্ষু এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাছাড়াও তিনি অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে জড়িত থেকে শাসন সদ্ধর্মের অগ্রগতিতে যথেষ্ট কাজ করে গেছেন। তিনি শ্রীমৎ হেমাঙ্কর মহাস্থবিরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীমৎ জ্যোতি প্রিয় অত্র এলাকার উদীয়মান ভিক্ষু হিসেবে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের থানা শাখার সভাপতি এবং রাজগুরু অগ্রবংশ শিশু সদনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বিলাইছড়ি থানা সদরে প্রতিষ্ঠিত ধুম্পছড় বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্বে আছেন। প্রয়াত শ্রীমৎ অনুরুদ্ধ স্থবির দীর্ঘকাল নারইখ্যা পাড়া সদ্ধর্মদয় বৌদ্ধ বিহারের অবস্থান করে অত্র এলাকার জন সাধারণের মধ্যে ধর্মীয় পরিবেশ ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করেন। তিনি অত্র বিহারেই দেহত্যাগ করেন। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের জনপদের কুতুবদিয়া বিহারের শ্রীমৎ অজিতা স্থবির অল্প বয়স থেকে ধ্যান ভান্তে নামে পরিচিত। বর্তমানে তিনি গভীর জঙ্গলে অবস্থান করছেন। শ্রীমৎ নন্দিয় স্থবির কাউখালী খোয়াপাড়া বিহারের অধ্যক্ষ এবং খোয়া পাড়া চন্দ্র বংশ শিশু সদনের পরিচালক হিসেবে শিশু কিশোরদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। রাজস্থলী মৈত্রী বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবির তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের বরেণ্য ভিক্ষু। তিনি ত্রিরত্ন ভিক্ষু সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি এবং বর্তমানে সভাপতির এবং রাজস্থলী বৌদ্ধ শিশু সদনের পরিচালকের দায়িত্বে আছেন। এবং আর্যনন্দ পালি কলেজের সভাপতিরও দায়িত্ব পালন করেন। শ্রীমৎ অগগশ্রী ভিক্ষু অধ্যক্ষ পাগলাছড়ি সর্বজনীন বৌদ্ধ বিহার রোয়াংছড়ি, বান্দরবান। তিনি সাধারণ সম্পাদক ও পরিচালক অনাথবন্ধু অনুরুদ্ধ শিশু সদনের উন্নয়নে কাজ করে যাচেছন। সুমেধানন্দ ভিক্ষু-ভিক্ষু সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র। ধর্ম দেশনার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন। তিনি রমতিয়া বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ। তরুণ ভিক্ষু বিশুদ্ধানন্দ রাজগুর অগ্রবংশ মহাস্থবিরের প্রিয়তম শিষ্য। তিনিও অধুনা থাইল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষায় রত।

তাছাড়াও আরো বহু শ্রামণ শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত আছেন। আশা করি ভবিষ্যতে অত্র এলাকার শিক্ষা সংস্কৃতির পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের বিশেষ বুদ্ধের থেরবদী মূলধারাকে উজ্জীবিত করতে এগিয়ে আসবেন। আর কিছু দায়ক দায়িকা আছেন বিশেষ করে বান্দরবান জেলা পরিষদের সদস্য প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, এডভোকেট দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা ও ওয়াগ্গার হেডম্যান পরিবার তারা স্বধর্ম পালনে ও প্রসারে সমাজ ও জাতিকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন। বলা যায় তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী ইদানিং শিক্ষা-দীক্ষায় আশানুরূপ উন্নতি দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে সমাজ ও সদ্ধর্মের ক্ষেত্রে আরো অনেক অবদান রাখতে সক্ষম হবে। অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রমী কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যাবসায়ী, আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল ধৈর্যশীল, প্রস্পরের প্রতি আত্মবিশ্বাসী, শ্রদ্ধাশীল ও বন্ধুবৎসল এবং কর্মে একনিষ্ঠ। বিশেষত তরুণ-তরুণী এং অভিভাবকদের মধ্যে একটি সুমধুর সম্পর্ক পরিপক্ষিত। এগুলো এক জাতির সার্বিক উন্নয়নের শুভ লক্ষণ বলে মনে হয়। উপরোক্ত বিষয়াবলী প্রকৃত বুদ্ধের শিক্ষা। এ চেতনায় অটুট থাকলে যে কোন জাতির অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী।

সহায়ক গ্রন্থ

১. শ্রীমৎ রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির জীবন ও ধর্ম - শ্রীমৎ ড. জিনবোধি ভিক্ষু
২. তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি- শ্রীমান বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
৩. তঞ্চঙ্গ্যা জাতি -শ্রীমান রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা
৪. পহ্‌র জাঙাল- তন্চংগ্যা শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ক প্রকাশনা

Scanned with CamScanner

আমাদের সংবাদপত্রে আদিবাসীদের প্রসঙ্গঃ সাম্প্রতিক প্রবণতাসমূহ

পার্থ শঙ্কর সাহা

আমাদের সংবাদপত্রে দেশের ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী সংক্রান্ত সংবাদ ইদানিং বেশ চোখে পড়ে। আট দশ বছর আগেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সংক্রান্ত সংবাদ খুব বেশি হতো না। এসব ছোট জাতিসত্তার মানুষ, তাঁদেরকে আদিবাসী হিসাবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পত্রিকাগুলোর মধ্যে কতকগুলো তাঁদের এই পরিচয়কে স্বীকার করে নিয়েছে। আবার কোনো কোনো পত্রিকা এসব জাতির মানুষের পরিচিতি 'উপজাতি' হিসাবে দিয়ে থাকে। পত্রিকাভেদে আদিবাসীদের পরিচিতির প্রশ্নে এ ধরনের বিভাজন আদিবাসী জাতিসত্তার মানুষদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থেকেই সৃষ্ট।

আমাদের দেশে 'আদিবাসী দিবস' বেসরকারি উদ্যোগে বেশ সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। এ-উপলক্ষে সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধান বাণী দেন। জাতিসংঘ ঘোষিত 'আদিবাসী দশক' এর কথা ফলাও করে প্রচার করা হয়। তবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের 'আদিবাসী' পরিচিতি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত নয়। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে দেশে ২৭ টি নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে আদিবাসীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়রা এ সংখ্যা আরো বেশি বলে দাবি করেন।

আমাদের দেশে এখন পত্র-পত্রিকার বেশ রমরমা অবস্থা চলছে বলা চলে। প্রায়ই নতুন পত্রিকা বেরোচ্ছে। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে গেছে, পত্রিকাও এখন নানা রঙ ধারণ করেছে। পত্রিকার পৃষ্ঠা বেশি হওয়ায় নানারকম সংবাদের সংখ্যা বেড়েছে। পত্রিকাগুলোতে আদিবাসীদের নিয়ে সংবাদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হয়তো পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই সাথে পত্রিকাগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা।

আদিবাসীদের নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে আদিবাসীদের নানা নিপীড়নের কাহিনী। আদিবাসীরা তখনই সংবাদ হন যখন তাঁদের ওপর কোনো হামলার ঘটনা ঘটে- এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এটা ঠিকও। আদিবাসীদের ওপর হামলার ঘটনার সংবাদের প্রাবল্য তাঁদের ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষের জীবনে হামলা দুর্ঘটনায় তো সব নয়। আদিবাসীদের জীবনযাপন, তাদের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নানাবিধ প্রচেষ্টা, উদ্ভাবন, সম্ভাবনা এসব কেন সংবাদের বিষয় হয়না ? একেবারেই যে হয় না তা নয় কিন্তু এসবের পরিমাণ খুবই কম। সংবাদপত্রগুলোর এসব বিষয় সম্পর্কে কম আগ্রহের কারণটি হয়তো আমাদের এই ভাবতে শেখায় যে আদিবাসী জীবনের সুক্ষ্ম ও গভীরতার নানা বিষয় সম্পর্কে আমাদের পত্রিকাগুলোর আগ্রহ কম বা জানতে চাওয়ার প্রচেষ্টার অভাব রয়েছে। আদিবাসীদের ওপরে হামলার বা নির্যাতনের সংবাদ পরিবেশনের পত্রিকাভেদে ভিন্ন হয়। পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় নীতি এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়। আদিবাসীদের প্রতি

Scanned with CamScanner

সংবেদনশীল পত্রিকাগুলো মোটামুটি ইতিবাচক অবস্থানে থেকে সংবাদ পরিবেশন করে। অপর পক্ষে রাজনৈতিক মতাদর্শের বিচারে দক্ষিণপন্থী এবং ইসলামী ভাবধারায় পরিচালিত বলে পরিচিত পত্রিকাগুলো আদিবাসীদের নিপীড়নের সংবাদগুলো খুব বেশি প্রকাশ করে না আবার প্রকাশ করলেও সেসব সংবাদ প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না- আদিবাসীদের অনেকেই এমন অভিযোগ করেন। এই ধারার সংবাদপত্রগুলোই 'উপজাতি' বা আরো অন্য ধরনের পরিচিত ব্যবহার করে যা আদিবাসী মানুষদের জন্য অসম্মানজনক। তবে প্রগতিপন্থী পত্রিকাগুলোর মধ্যে কিছু পত্রিকা আদিবাসীদের ওপর পীড়নের সংবাদ দিতে গিয়ে অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে অনেক সময়। একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি।

বছর তিনেক আগে সিরাজগঞ্জের তাড়াশ থানার একটি আদিবাসী গ্রামে হামলার ঘটনা ঘটেছিল। একটি সরকারি প্রকল্প জোর করে আদিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অভিযোগ উঠেছিল তখন। ঐ গ্রামটিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের পক্ষ হয়ে কিছু লোক আদিবাসীদের গাছ কেটে ফেলেছিল। একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় (প্রচার সংখ্যার বিচারে) পত্রিকা এই ঘটনার সংবাদ প্রকাশ করে। শীর্ষস্থানীয় আদিবাসী নেতৃবৃন্দ ঐ স্থানটি পরিদর্শনের যান। তখন আমি নিজে ঐ পত্রিকার প্রতিবেদন প্রকাশ এবং নেতৃবৃন্দের পরিদর্শনের পর ঐ গ্রামটিতে যাই। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে যে পরিমাণ ক্ষতির কথা বলা হয়েছিল তা আসলে সঠিক ছিল না। আদিবাসী সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে ঐ পত্রিকাটির এ রকম বাড়িয়ে বলার প্রবণতা আরো কিছু সংবাদের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি। অনেক সময় প্রতিবেদক আবেগ সংযত করতে পারেন না। এর ফলে প্রতিবেদনে অতিরঞ্জনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু এতে নিগৃহীত মানুষের ক্ষতিই হয় বেশি। বিরুদ্ধ পক্ষ তখন সুযোগ নেবার অপেক্ষায় থাকে। পুরো অপরাধ ধামচাপা দেবার চেষ্টায় থাকে। সংবাদে এই রঙ চড়িয়ে দেবার প্রবণতা আদিবাসীদের মাঝে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো এবং প্রচার সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রেখেই করা হয়। ছোট-খাট সংবাদ বড় করে লেখার প্রবণতা থাকলেও প্রচার সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে থাকা প্রগতিপন্থী বলে পরিচিত অনেক পত্রিকা আদিবাসী মানুষের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল বিষয়ের প্রতি অনেকসময় বিশেষ মনোযোগী হয় না।

২০০৩ সালের আগস্ট মাসে খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে স্থানীয় বাঙালিদের কয়েকটি গ্রুপ হামলা চালিয়ে দু'জন পাহাড়িকে হত্যা করে। সে সময় ৬ জন পাহাড়ি নারী ধর্ষিতা হন বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় আদিবাসী মানুষ। ঐ হামলায় নয়টি পাহাড়ি গ্রাম পুড়িয়ে ফেলে সেটেলার বাঙালিরা। এই অপকর্মগুলোতে সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে বলে অভিযোগ করেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে। ঘটনার সময় জাতীয় পত্রিকাগুলো বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশ করে যার বেশিরভাগই ছিল ঘটনার সাদামাটা বর্ণনা। মহালছড়ির ঘটনা ছিল পার্বত্যাঞ্চলে আপাত শান্ত পরিস্থিতির ওপর একটি আঘাত।

Scanned with CamScanner

তবে এটি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধ্বংসের যে মহাযজ্ঞ হলো মহালছড়িতে, তা অনেকগুলো ঘটনার সাথে যুক্ত। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক নানা স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকা এই ঘটনায় যথেষ্ট- তৎকালীন পার্বত্যাঞ্চলের আর্থ-রাজনৈতিক নানা ঘটনাপ্রবাহ এমন মনে করতে বাধ্য করায়।

বিস্ময়করভাবে আমাদের পত্রিকাগুলো ঐ হামলার কিছু বর্ণনা এবং হামলার পর সরকার গৃহীত 'নানা কার্যক্রম'-এর বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হয় ঘটনার প্রকৃত কারণ দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। আর্ন্তজাতিক নানাগোষ্ঠী যারা পার্বত্য এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তাদের কার্যক্রম নিয়ে গভীরতাসম্পন্ন বা অনুসন্ধানী কোনো প্রতিবেদন একেবারেই নেই। এসব উন্নয়ন গোষ্ঠীর সাথে বিজ্ঞাপন বাণিজ্যের যে সম্পর্ক তৈরি হয়ে আছে তা যাতে কোনোভাবেই নষ্ট না হয় এসব ব্যাপারে পত্রিকাগুলো যথেষ্ট সতর্ক থাকে বলেই মনে হয়।

আদিবাসী জনপদসমূহের প্রায় অভিন্ন এক সমস্যা ভূমি সমস্যা। আদিবাসীদের ওপর নিগৃহের বড় কারণ ভূমি। ভূমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গোলমাল এবং পরে হামলা–আদিবাসীদের ওপর নিগৃহের ধরন মোটামুটি এমনই। আর পত্রিকাগুলোও এসব ঘটনা ঘটার পরই সংবাদ করে, চিরায়ত এই সমস্যা নিয়ে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্ট কোথায় আমাদের পত্রিকায় ?

একটি বিশেষ শ্রেণির পত্রিকায় আদিবাসীদের নিয়ে নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশের যে প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেই প্রবণতা কিছুটা প্রগতিপন্থী বলে পরিচিত অনেক পত্রিকাতেও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। যেমন জুম চাষ শুরু হলেই 'পাহাড়ে আগুন, বন ধ্বংস,' 'পাহাড়ে আগুন জ্বলছে, বৃক্ষ পুড়ে ছাই,' ইত্যাদি নানা শিরোনামে সংবাদ যে প্রকাশিত হবে এটা মোটামুটি আগে থেকেই বলে দেয়া যায়। এটা অনেক প্রগতিবাদী পত্রিকাতেও দেখেছি। আদিবাসী জীবন ও জীবিকা এবং ভূগোলের তাঁদের সাথে সম্পর্কহীন মানুষই এমন সংবাদ পরিবেশন করতে পারে।

আবার এমন গুরুচন্ডালী সংবাদ শিরোনাম চোখে পড়ে 'আদিবাসী দিবস উপলক্ষে উপজাতীয়দের র‍্যালি,' কিংবা 'আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপজাতি নৃত্য'। প্রতিবেদনসমূহ সম্পাদনার কাজে যাঁরা আছেন তাঁদের অজ্ঞতা, চিন্তার ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতার জন্যই ঘটে। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে যত্নের অভাবও একটা কারণ। যে কথা বললাম, আদিবাসী জীবনের বাস্তবতা, জটিলতা যেমন পত্রিকায় আসে না এর পাশাপাশি আদিবাসীদের উৎসব বা নৃত্য-গীত পরিবেশনের দৃশ্য সংবলিত ছবি ছাপার ব্যাপারে পত্রিকাগুলো কিন্তু বেশ সক্রিয়। আবার সেখানেও আরেকটি প্রবণতা হলো পোষাক এবং গহনা পরিহিতা আদিবাসী নারীমুখের প্রাধান্য।

আমি নিজে যে প্রতিষ্ঠানটিতে কাজ করি সেখানে আদিবাসীদের সংস্কৃতি নিয়ে একটি কর্মসূচি রয়েছে। দেশের বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী যাঁরা আদিবাসী জীবনের সাথে পরিচিত নয় তাদেরকে ধারণা

Scanned with CamScanner

প্রদানের জন্য এই কর্মসূচি। কর্মসূচির অংশ হিসাবে ঢাকায় বছর দুয়েক হলো আদিবাসী সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে আদিবাসীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান প্রদর্শনের পাশাপাশি আদিবাসী জীবন, উন্নয়ন, সম্ভাবনা বস্তুত ব্যাপকার্থে সংস্কৃতির যে ধারণা তা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়। দেখা যায় উৎসবের প্রারম্ভে যে র‍্যালি করা হয় তার ছবি সংগ্রহে এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের ছবি তোলায় পত্রিকার লোকজন যতো সক্রিয় আদিবাসী জীবনের নানা বিষয়াদি নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা বা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক আইটেমগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভের ব্যাপারে ততোটাই অনাগ্রহী। আর এর প্রভাব পড়ে সংবাদপ্রত্রে প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে। দেখা যায় কোনো জাতিগোষ্ঠীর নৃত্যের ছবি ছাপা হলো কিন্তু ক্যাপশনে ছাপা হলো অন্য জাতিগোষ্ঠীর নাম।

আমাদের পত্রিকাগুলো অনেকসময় বর্ণবাদী আচরণ করে–এ অভিযোগ আমার একার নয়, আদিবাসীদের অনেকের। প্রমাণ দিচ্ছি। আমাদের পত্রিকায় অপেক্ষাকৃত শ্বেত বর্ণের পাহাড়িদের ছবি (তাও আবার নারীদের ছবি) যত ছাপা হয় দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, যাদের গায়ের রঙ কালো তাদের ছবি ততো আসে না। পত্রিকায় প্রকাশিত ছবির দিকে লক্ষ্য করলে যে কেউ এ-সত্য উপলব্ধি করবেন।

এতোক্ষণের আলোচনায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আদিবাসী বিষয়ে আমাদের সংবাদ পত্রগুলোর অবস্থানের প্রবণতা নিয়ে কিছু কথা লিখলাম। প্রবণতাগুলো নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকেই হয়তো লেখার অভিযোগের সুর খুঁজে পাবেন। পত্রিকার পাঠক হিসাবে একটি নির্দিষ্ট ইস্যুতে যে প্রবণতাগুলো আমি চিহ্নিত করতে পেরেছি তা নিয়েই লিখলাম- কাউকে অভিযুক্ত করার জন্য নয়।তবে বিষয়টি নিয়ে আরো ব্যাপক আকারে কাজ হতে পারে, হওয়া প্রয়োজন। সেটা হলে আমাদের সংবাদপত্রগুলোর, একটিমাত্র বিষয়ে হলেও, অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। শুধু সংবাদপত্রগুলোর চরিত্র নির্ণয়ে নয়, আর্থ-রাজনৈতিক নানা প্রবণতার চিত্র এই কাজের মাধ্যমে উঠে আসতে পারে। সেটা সমকালীন সমাজ বাস্তবতার মূল্যায়নে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় হতে পারে।

Scanned with CamScanner

তনচংগ্যাদের জুম চাষ, মিথলজি

কর্মধন তনচংগ্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জুম চাষের সাথে সম্পৃক্ত তনচংগ্যারা তাদের মধ্যে অন্যতম। জুম সংস্কৃতির মতো তাদেরও রয়েছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির উর্বর উপকরণ ভাষা, সাহিত্য, গান, উবাগীত, বারমাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, শিষ্টাচার, পূজাপার্বন ও আদি কবি শিবচরণ। বর্তমান সময়ে কিছু পরিবারের মধ্যে চাকরীজীবি থাকলেও মূলত জুম চাষের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন নির্বাহ চলে ।

পাহাড়ের জঙ্গল পরিষ্কার করে আগুনে পুড়িয়ে জমিতে যে চাষের ব্যবস্থা করা হয় মূলত এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ ও আমাদের দেশে জুম চাষ হিসেবে পরিচিত। শুধু আমাদের দেশে নয় পৃথিবীর অনেক দেশের (ফিলিপাইন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া , মধ্য আমেরিকা , নেপাল, আফ্রিকা) আদিবাসীরা এই পদ্ধতিতে জুম চাষ করে থাকে।

জুমচাষ সাধারণত পাহাড়ে বসবাসরত অনগ্রসর জাতিসত্ত্বা (যাদের সমতলে লাঙ্গল চাষের তেমন জমি নেই) আদিবাসীরাই করে থাকে। ১৮১৮ সালের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষই ছিল একমাত্র কৃষি চাষ পদ্ধতি। মূলত এইওজুম সংস্কৃতির সাথে আদিবাসীর সংস্কৃতি প্রত্যেক্ষ-পরোক্ষ ভাবে জড়িত। তারা জুমকে খুব বেশী ভালোবাসে, কেননা জুম তাদের শুধু ভালোবাসা দেয় না, খাদ্য-সংস্থান ও অধিকার আদায়ের ঐক্যতা আর বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণাও যোগায়। তারা জুমে প্রায় সব ফসলাদি ধান, আদা, হলুদ, মরিচ,আলু, কচু, বেগুন, কলা ,পেঁপে, তুলা নানাজাতের দেশী স্থানীয় শাক-সবজি উৎপাদন করে থাকে। এক সময় তেল, লবন, নাপ্পি (চিদল) ছাড়া আদিবাসীদের কোন কিছুই কিনতে হতো না । তাদের সুন্দর স্বনির্ভর জীবন ছিল, স্বপ্ন ছিল এই জুমকে কেন্দ্র করে।

নিবন্ধের শিরোনামের সাথে মিল রেখে তনচংগ্যাদের জুম চাষের সাথে পৌরাণিকের যে একটা সম্পর্ক রয়েছে লক্ষীমার বসুমতিতে আগমনে পৌরাণিক(mythology)কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তা ফুটে তোলা হয়েছে ।

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাকে বারোমাস লালন-পালন করার মতো , উপকরণ বা উপাদান সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষের জীবন শুরুতে যাযাবর ছিল। তারা জীব-জন্তু পশু-পাখি শিকার করে কাঁচা পরে আগুন আবিষ্কার হলে আগুনে পুড়ে খেতো। পৌরাণিকের মতে সে সময় মানুষের রাতের চোখ ছিল, যা পশুপাখিদের ছিল না। আর হাটুর ঘিলাটা পেছনে ছিলো বলে পশুদের চেয়ে বেশী দৌড়াতে পারতো। এভাবে তারা পশু-পাখি শিকার করে জীবন নির্বাহ করতে লাগল। পরে পশুরা অতিষ্ঠ হয়ে সবাই মিলে রাজার (সৃষ্টিকর্তা) কাছে অভিযোগ করল। পরে রাজা মানবদের রাতের চোখ পশুদের দিয়ে দেয়। অন্যদিকে আবার ভূত-প্রেত ও দেবতারা মানবদের আক্রমণ করলে তাদের জীবনও নতুন করে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। পরে তারাও রাজার

Scanned with CamScanner

কাছে অভিযোগ জানালে রাজা তাদের কথা শুনে কুকুরদের নিয়োগ করলেন মানবদের পাহারাদার হিসেবে। এরপর রাজা চিন্তায় পড়লেন বারমাস কিভাবে মানবরা বেঁচে থাকবে। এরপর সিদ্ধান্ত হলো মানবরা গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকবে। তারা যখন গাছের পাতা খেতে শুরু করলো তখন গাছেরা সবাই মিলে রাজার কাছে অভিযোগ করলো যে তাদের বেঁচে থাকার হুমকী হয়ে পড়েছে , মানবেরা তাদের(গাছের) পাতা খেয়ে ধংস করে দিচ্ছে। তারা নিজেদের জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ও প্রাণী কুলের জন্য অক্সিজেন ছাড়তে পারছে না। গাছের অভিযোগের ভিত্তিতে পরে দায়িত্ব দেওয়া হয় মাটিকে, মাটিরও একই অভিযোগ রাজার কাছে। মানবেরা খেয়ে তার হাঁড় বের করে দিচ্ছে, ধক্ষংস করছে। তখন রাজা পড়লেন মহা চিন্তায়। কে দায়িত্ব নেবে তাহলে এই মানব কুলের। পরে স্বআগ্রহে এগিয়ে এলেন চড়ই গাছ(ডুমুর গাছ) আর ইজ্যা(মূলি) বাঁশ, তারা উভয়ে ছয় মাস করে মানবকে লালন-পালন করবে। পরবর্তীতে দেখা গেল চড়ই গাছ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারলেন না , ইজ্যা(মূলি) বাঁশ রাখতে পারলেও। রাজা রাগে চড়ই গাছকে কোমড়ে দিলেন একটা লাথি। তনচংগ্যাদের বিশ্বাস সেই পর থেকে চড়ই গাছ অর্ধ বাঁকা হয়ে পাহাড়ের ঢালু জায়গায় জন্মায়। ইজ্যা বাঁশ তার প্রতীজ্ঞা রক্ষা করতে পেরেছে বলে রাজা তাকে বর দিলেন । রাজা বললেন আজ থেকে তুমি বাঁশের রাজা এবং যেকোন কাজে তোমার ব্যবহার অগ্রগণ্য। উল্লেখ্য কচি অবস্থায় বাঁশকে আদিবাসীরাওবাঁশকরল’ নামে সবজি হিসেবে ব্যবহার করে। রাজা ভাবতে লাগলেন মানব কুলকে তো ইজ্যা(মূলি) বাঁশ ছয় মাস লালন করল বাকী ছয় মাস কে লালন করবে। তখন রাজাসহ সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল বসুমতিতে লক্ষীমাকে নিয়ে আসার, যে ভাবা সে কাজ । রাজার পরামর্শ মতো কয়েকজন মিলে রওনা হলো লক্ষীমার বাড়ির উদ্দেশ্যে। লক্ষীমার বাড়ি গিয়ে সব বুঝিয়ে বলা হলো বসুমতিতে মানবদের অবস্থা এবং বলা হলো স্বয়ং রাজা পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যেতে। লক্ষীমা চিন্তা করে সম্মতি দিয়ে বলল ঠিক আছে যাবো। এই বলে লক্ষীমা তার ঘরের ভিতর ঢুকলেন এবং রওনা দেওয়ার সময় পুটুলীতে করে অনেকগুলো জিনিস নিয়ে নিলেন। তনচংগ্যা সমাজে কথিত আছে লক্ষীমা পুটুলীতে করে নিয়ে আসা জিনিস গুলিই হচ্ছে মূলত জুমচাষের সমগ্র উপকরণ ও নিয়মনীতি। আসার সময় পথে নদী-নালা , খাল-বিল, সমুদ্র-সাগর পার করে দেওয়ার জন্য সাহায্য করলো শুকর , কাঁকড়া ও মাকড়সা। লক্ষীমা সাগর পার হওয়ার সময় শুকরের পিঠের উপর চড়ে বসল আর শুকর পা রাখল কাঁকড়ার উপর আর লক্ষীমা যাতে শুকরের পিট থেকে পড়ে না যায় কিছু একটা ধরে শক্ত করে বসতে পারে সেজন্য মাকড়সা নিজের আঁশ দিয়ে সাগরের এপার ওপার একটি রেহা (দড়ি) তৈরি করে দিলেন। পার হয়ে লক্ষীমা প্রত্যেককে বর দিলেন ভবিষ্যত জীবন সুখ শান্তিতে থাকার জন্য। কাঁকড়াকে বললেন জুমিয়ারা যখন জুম চাষ করবে জুমের ছড়ায় তখন প্রচুর ফল মারফা , মিষ্টি কুমড়া পচে এসে পড়বে , ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এগুলি গিয়ে তুমি মজা করে খেতে পারবে আর বাকীটা সময় নাইনসা গাতে (গভীর গর্তে) গিয়ে কচি কাদা খেয়ে থাকবে । শুকরকেও একই বর দিল ধান পাকলে সেগুলি গিয়ে খেতে পারবে তবে জুমিয়ারা পাহারা দিলে সাবধানে যাবে। আর মাকড়সাকে বলল ভাদ্র-আশ্বিন মাসে তোমার যাতে খাদ্যের অভাব না হয় সেজন্য পাহাড়ের নিচে

Scanned with CamScanner

এপার-ওপার জাল বুনে পোকা-মাকড় ধরে ধরে খাবে । আশ্চর্য হলেও সত্যি ভাদ্র-আশ্বিন মাসে পাহাড়ে এই দৃশ্য অহরহ চোখে পড়ে।

বসুমতিতে এসে লক্ষীমা উঠলেন মিত্তিন্যা নামে এক অলসের বাড়িতে । ঘর উঠান পরিস্কার রাখা শুধু তাঁর কাজ । এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যই মূলত লক্ষীমার এই অলসের বাড়িতে উঠা। তাঁর আগে অবশ্যই অনেক জনের ঘর ঘুরলেন। লক্ষীমার মিত্তিন্যার বাড়িতে উঠার পরবর্তী যে কর্মময় সময়গুলি এগুলি মূলত তন্‌চংগ্যাদের জুম সংস্কতির একটা অংশ। জুমচাষের মাধ্যমে লক্ষীমার মানব কুলকে বাঁচানোর যে দায়িত্ব ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই বসুমতিতে এসেছেন জুমচাষের মাধ্যমে মূলত এর শুরু।

একদিন লক্ষীমা অলস মিত্তিন্যাকে বলল জুম কাটতে হবে । কিছুটা আশ্চর্য হয়ে মিত্তিন্যা বলল জুম সেটা আবার কি? কারণ এর আগে সে জুম এবং সেটা কি কখনো শুনিনি এবং দেখিনি। পরে লক্ষীমা সব বুঝিয়ে বললে মিত্তিন্যা এমন একটা ভাব দেখাল যে যেন এর দ্বারা এই সব জুম-টুম কিছুই হবে না। সব বুঝে লক্ষীমা বলল আগামীকাল তুমি জুমের জায়গা দেখতে যাবে এবং দেখা হলে আমি দেখিয়ে এবং শিখিয়ে দেব কিভাবে কোন জায়গা থেকে জুমকাটা আরম্ভ করবে । এখানে উল্লেখ্য যে পরিবারের কর্তার জম্মবারে জুমকাটা শুভ নয়।

জুমের জায়গা নির্বাচন হলে এরপর জুমিয়াকে মাটির রঙ দেখে নির্ধারণ করতে হয় কোন মাটিতে কোন ফসল ভাল জন্মাবে। সেজন্য তন্‌চংগ্যাদের জুম চাষের ক্ষেত্রে মাটি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এভাবে দেখা যায় জুম চাষের মাটিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় এবং অনুমান করা যায় কোন মাটিতে কোন ফসল ভালো জম্মাবে।

১. বালু মাটি- শস্য-ফসলাদি কম হয় , তবে আম, লিচু, কাঠাঁল ভালো জম্মে।
২. করুলি মাটি(বড় দানা বালু মাটি)- শস্য -ফসলাদি কম হয়।
৩. মোইন্যা মাটি(এটেঁল মাটি)- ফসলাদি কম হলেও ধনে পাতা ও কলা ভালো হয়।
৪. মোইন্যা করুলি মাটি- আদা, হলুদ ভালো হয় ।
৫. বালু করুলি মাটি- শস্য ও ফসলাদি কম হয়।
৬. পেক্কয়্যা মাটি(কাদা মাটি)- ক্ষেত কম হয়।

লক্ষীমার কথা মত জায়গা নির্বাচন করে মিত্তিন্যা জুম কাটতে গেল (জুম কাটাও কিন্তু তন্‌চংগ্যা সমাজে একটা উৎসব, এই নিয়ে তন্‌চংগ্যা উবাগীতেঞ্জুম কাবাপাল্ল্ব নামে একটি পর্ব আছে) এবং লক্ষীমাই দেখিয়ে দিল কোন জায়গা থেকে আরম্ভ করতে হবে। একটি বড় লোদি(লতা) দেখে লক্ষীমার কথা মতো মিত্তিন্যা সারাদিন কাটল, অবশেষে যখন কাটা শেষ হলো তন্‌চংগ্যা জনশ্রুতিতে আছে এই লতাটি সাতদিন সাতরাত বিরাট শব্দ করে ভূ-পাত হয়েছে । মানে এই লতাটিই পুরো চাষযোগ্য জমিকে জঙ্গলময় করে রেখেছে। এই লতাটির নাম হলো- ঘিলা লোদি আর জায়গাটির নাম টাক্কয়্যা ছড়া বার মুড়া তের ডনা। ঝোপঝার যখন রোদে শুকিয়ে গেল, লক্ষীমা মিত্তিন্যাকে বলল জুমে গিয়ে সব পশুপাখি, কীটপতঙ্গকে বলবে আগামী কাল আমি জুমে

Scanned with CamScanner

আগুন দিতে আসবো তোমরা সবাই যে দিকে পারো চলে যেও। যথাসময়ে জুমে আগুন দেওয়া হলো, ভালো মতো পুড়ে গেছে কিনা দেখতে যাবে মনঃস্থির করলে লক্ষীমা বলল দক্ষিণ কোণার দিকে যেওনা। লক্ষীমার কথা অগ্রাহ্য করে কৌতূহল বশতঃ গিয়ে দেখে একটি সাপ অর্ধমরা পুড়া অবস্থায় কাটরাচ্ছে এবং মিত্তিন্যাকে গালমন্দ করছে। 'মিত্তিন্যাকে পাইদুং তা মাদাবা কাইদোং'(মিত্তিন্যাকে পেতাম তার মাথাটা খেতাম)। সে সাপের একশটি মাথা একটি লেজ। জুম না পোড়ানোর আগে অবশ্যই দুটি সাপ অন্যটির একটি মাথা একশটি লেজ এদের মধ্যে বাক্যব্যয় হয় চলে যাওয়ার জন্য। তখন একশতটি মাথাওয়ালা সাপ বললো আমার একটি মাত্র লেজ একশটি মাথা নিয়ে পালাতে কোন সমস্যা হবেনা, বরং তোমার সমস্যা হবে একটি মাথা একশটি লেজ বহন করে নিতে। এই কথাটি চিন্তা করে একটি মাথাওয়ালা সাপ পালিয়ে গেল। এই সাপ দুটির নাম- **মণিরাম সর্প**। বাড়িতে এসে মিত্তিন্যা মো পক্কা (গাল ফুলা) করে বসে রইল। লক্ষীমা বলল- তোমার কি হয়েছে? (লক্ষীমা আসলে অলৌকিক ভাবে সব জানে এবং দেখে)। মিত্তিন্যা বলল জুমে গিয়ে একটি সাপ আমাকে গালমন্দ করেছে এবং আমার মাথা খাবে বলছে। আমার কি দোষ আমি গিয়ে সবাইকে তো সরে যেতে বলেছি। লক্ষীমা না জানার ভান করে বলেছে তাই নাকি! তারঁপর বলল ঠিক আছে সব ঠিক হয়ে যাবে।

একদিন দুপুর বেলা লক্ষীমা মিত্তিন্যাকে বলল জুমতো কাটা হলো, আগুন দেওয়া এবং আরাকাচা(পরিষ্কার)ও হলো। এবার শস্য ফসলাদি রোপনের পালা। এই বলে সে তাঁর নিয়ে আসা পুটুলি থেকে ধান, আদা হলুদ , কলা , পেঁপে ,কচু আলু , শাক-সবজির বীজ বের করলেন। ধান, আলু ও শাক-সবজির বীজও রয়েছে কয়েক জাতের। এখানে উল্লেখ্য যে, জুমেতে ধান বপন করার আগে কলা, আদা হলুদ, কচুসহ নানা জাতের আলু বিশেষ করে মু, গাত্তুয়া , কাইন্যা, পেলা ও কাপ্পিলা আলু রোপন করা হয়। অন্যান্য শাক সবজি বিশেষ করে জুয়ালো, মারফা বীজ, কউন, উবাকউন , জদনা, মায়াশাক , পুসিশাক, অসউন শাক, সাবেরেং, বিদুংগুলা, আমিলা, জুমশমই, বেগুন, চিইড়াসহ নানা ধরনের ফুলের ও ফলের বীজ সারা জুমময় ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তবে ফুলের বীজগুলো পথের দ্বারে দ্বারে ছিটিয়ে দেওয়া হয় । আর লম্বা গাছের গোড়া ও আগাছার পঁচা স্তুপ দেখে রোপন করা হয় সুমুরিগুলা, কমুড়া, ঝিঙা,পুতুল, কউদা, কুরাঙা শমইসহ মারফার বীজ। এ সমস্ত ফসলাদি ধরন, আকার, গন্ধ, স্বাদ পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তন্চংগ্যাদের জুম চাষের পর্ব শুরু হয় সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে। তবে বিষু (বাংলা নববর্ষ) পূর্ববর্তী থেকে জুমকে চাষযোগ্য প্রস্তুতি করে রাখা হয়। আর জুমে ফসলাদি রোপন কিছুটা বৈশাখের নতুন বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। সেজন্য সে সময় জুম চাষিরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে কখন বৃষ্টি হবে, তারা অবশ্যই অনুমানও করতে পারে আকাশে অবস্থা দেখে এবং কিছু কীটপতঙ্গের শব্দ শুনে ।

রাত্রে খেয়ে দেয়ে উঠানে বসে লক্ষীমা মিত্তিন্যাকে বলল- জুমতো কাটা হলো এখন ফসলাদি

Scanned with CamScanner

২. গেলং ধান- দুই ধরনের আছে। ধান লালছে সাদা গাছ ছোট, চাল সাদা লালছে।
৩. লেন্দা চিয়ন ধান- কেউ কেউ কুকি ধানও বলে, দু ধরনের ধান আছে। গাছ ছোট, ধান ও চাল উভয়ের রঙ সাদা লালছে।
৪. মংগোই /মংকোই ধান- গাছ একটু লম্বা, ধান দুই ধরনের, ধানের রঙ সাদা তবে চালের রঙসাদা ও লালছে।
৫. কনকতারা ধান- গাছ মধ্যম সাইজের, ধান ও চাল একটু লালছে।
৬. সোনালী ধান-গাছ লম্বা, চালের আকার ছোট এবং আগায় সুইয়ের মতো লেজ আছে ধান ও চালের রঙ সাদা।
৭. বাদিয়া ধান- গাছ নিচু , ধান গোলাকার , ধান ও চালের রঙ সাদা।
৮. তুর্কি ধান- গাছ ছোট , ধান গোলাকার, আগে রোপন করলেও পাকে সবার শেষে। ধান ও চাল কালো ও লালছে হয়। তবে ঢেঁকিতে বানলে চালগুলো সাদা ও সুস্বাদু হয়।
৯. চিংগোই ধান- গাছ লম্বা, পাকতে একটু দেরী হয়। ধান ও চালের রঙ সাদা।
১০. চড়ুই ধান- গাছ মাঝারী , ধান গুলো লম্বা, ধান ও চালের রঙ সাদা।
১১. সুরি ধান-গাছ মাঝারি , ধানগুলো লম্বা, ধান ও চালের রঙ সাদা।
১২. চাঙগিরি/চাইগারাঙ গিরি দান- কথিত আছে এগুলি হাতির মল থেকে প্রাপ্ত। গাছ মাঝারি ধান গোলাকার ধান ও চালের রঙ সাদা।
১৩. ফুল বালাম ধান- গাছ ও ধান মাঝারি লম্বা করে। ধান ও চালের রঙ সাদা।

বিনি ধানঃ-

১. গরয়া বিনি- জনশ্রন্নতিতে আছে এই বিনি চাল রান্না করলে গরয়া(অতিথি) আসে। গাছা মাঝারি। চাল মোটা, ধান ও চালের রঙ সাদা।
২. সুরি বিনি- গাছ মাঝারি,ধান লম্বা মোটা, ধান ও চালের রঙ সাদা।
৩. বান্তর নখ বিনি- গাছ উচু, ধান ও চাল মোটা, ধান ও চালের রঙ সাদা কালছে।
৪. কালাবিনি– গাছ মাঝারি। গাছ, ধান চাল সবিই কালো, ধরলে এমনকি হাত ও কাঁচি পর্যন্ত কালো হয়ে যায়। দেখলে খেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু খেলে সুস্বাদ।
৫. নলবিনি -গাছ উচু , ধান ও চাল লাল।

পরের দিন জুমে যাওয়ার সময় লক্ষীমা বলল জুম থেকে কিছু শাক সবজি নিয়ে এসো, মিত্তিন্যা বলল জুমে এখনো কোন কিছুই রোপন করা হয়নি আর তুমি বলছ শাক-সবজি নিয়ে আসতে। লক্ষীমা বলল ওখানে চাষ না করেও খাওয়ার উপযুক্ত অনেক শাক-সবজি পাওয়া যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, জুম পরিস্কার করার সময় চাষ না করেও অনেক শাক-সবজি পাওয়া যায় যেগুলি জুমিয়াদের কিছুটা শাকের চাহিদার পূরণ করে। এগুলি আবার আগাছার অংশও বটে, এই শাকগুলি হলো-

১. কিরিমা শাক- কাটাযুক্ত, কিছুটা টক, সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়।
২. নেলঙ পাতা- গাছ মাঝারি, পাতা বড় কালছে সবুজ। রান্না ও সিদ্ধ করে খাওয়া যায়, তেতো
৩. কুমাজ্যা আখা- সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়, তেতো।

Scanned with CamScanner

৪. বাঙালা শাক - সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়, তেতো ।
৫. তিডা /আইত বেউল- গাছ মাঝারি কাঁটাযুক্ত,রঙ সবুজ,ফল ছোট, সবুজ,খেতে তেতো ।
৬. অবেলা শফুল-গাছ লম্বা, চিকন, ফুলটি সবুজ। এটি মূলত সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।
৭. তিল্লয়া শাক- গাছ মাঝারি, পাতা কালছে সবুজ, তেতো , রান্না করে খাওয়া যায়।
৮. কিরিশাঙ পাতা- পাতা লালছে সবুজ , পাতা লম্বা, টক, সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়।
৯. বানতর মাম্মা- লতা ও ফলটি সবুজ, কাটাযুক্ত, কাঁচা ও রান্না করে খাওয়া যায়।
১০. কউয়াং আলু- এইগুলি সাধারণত জুমের শেষের দিকে হয়। আলুটি লম্বা ও মাটির গভীরে হয়।

সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়। উল্লেখ্য- যে মুক্তিযোদ্ধের সময় স্থানীয়রা খাদ্যের অভাবে খুড়ে খেতে গিয়ে দুর্বল শরীর নিয়ে এই গর্তে পড়ে অনেকে মারা গিয়েছিল।

বৈশাখের প্রথম বৃষ্টির শুরুতে জুমিয়াদের যে কর্মব্যস্ততা দেখা যায় আমরা তন্চংগ্যাদের আদি কবি শিবচরণ এর শিষ্য উদ্ধ এর মনের অবস্থা থেকে বুঝতে পারি। শিবচরণ যখন তাঁর শিষ্যকে নিয়ে দেশান্তর (অলৌকিক) হয়ে যাচ্ছেন, তখন বৈশাখের আকাশের মেঘের গর্জন শুনে তাঁর স্বজনের, স্বজাতির জুমচাষের কথা মনে পড়ে এবং ফিরে আসে।

এখানে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য করেছি যে, ধানের সাথে আগে এবং পরে যে সব সবজি, ফসল রোপন করা হয় কলা, আদা, হলুদ ছাড়া সেগুলো হলোঃ–

১. সুমুরি গুলা- কচি অবস্থায় কালছে সবুজ, পাকলে লালছে, নরম মাটির গুলি মিস্টি হয়। তবে বালু মাটির গুলি তেমন মিষ্টি হয়না।
২. জুম কমুড়া- কচি অবস্থায় সবুজ কাঁটাযুক্ত, পাকলে সাদা, ছোট-মাঝারি আকারের হয়। আগাছার স্তুপে রোপন করা হয়।
৩. সিল কুমুড়া- কচি এবং পাকলে সবুজ, ছোট মাঝারি আকারের হয়।
৪. চাল কুমুড়া- এগুলো সাধারণত চালের উপর হয় । ছোট মাঝারি আকারের হয়,টক।
৫. কউন- কাকন চাল নামে সর্বাধিক পরিচিত। জুমের পাদতলে , পথের ধারে সাধারণত ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ধান ও চাল লালছে হলুদ।
৬. উবাকউন- গাছ উচু লম্বা , তবে কউনগুলো খাওয়া যায় না । কথিত আছে জুম ও ঘরকে অশুভ হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই কউনগুলি ব্যবহার করা হয়। এগুলো ছিটিয়ে দিতে হয়।
৭. জদনা- আঁখ এবং কই জাতীয় ফসল, এগুলি ছিটিয়ে দিতে হয়।
৮. জুয়ালো- পার্বত্য চট্টগ্রামে ঠান্ডা আলু নামে সর্বাদিক পরিচিত। আলুটা সাদা বাইরে এবং ভিতরে , ধানের সাথে মিশ্র করে রোপন করা হয়।
৯. মাম্মা - মারফা নামে পরিচিত, ধানের সাথে এবং আলাদা করে রোপন করা হয়।
১০. ঝিঙা/পুতুল/কউদা- জুমসবজি , আলাদা করে ছোট গাছের গোড়ায় এবং আগাছার স্তুপে রোপন করা হয়।

Scanned with CamScanner

১১. গুউচ্ছ্যা(তিল)– আলাদা করে ছিটিয়ে দিতে হয়। কুমুড়া, মায়াশাক, জুমসমই এর সাথে রান্না ও ভত্তা করে খাওয়া যায়।

১২. মু আলু- লতা জাতীয়, আলু চামড়া লালছে আঁশযুক্ত। ভিতরে সাদা, আগুনে পুড়ে সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়। আলাদা ভাবে রোপন করতে হয়।

১৩. খাপ্লিলা আলু- গাছ লম্বা, আলুটাও লম্বা, উপর লালছে মোটা চামড়া। ভিতরে সাদা, সিদ্দ, রান্না ও পুড়ে খাওয়া যায়। খেজুর রস দিয়ে খেতে মজা, আলাদা ভাবে রোপন করতে হয়।

১৪. কাইন্ন্যা আলু- লতা জাতীয়, চামড়া লালছে ভিতরে সাদা লালাযুক্ত। এগুলি সাধরণত পাহাড়ের খাড়া জায়গায় হয়। রান্না করে খাওয়া যায়। আলাদা ভাবে রোপন করতে হয়।

১৫. পেলা আলু- লতা জাতীয়, দেখতে অনেকটা পাতিলের মতো গোলাকার চামড়া লালছে, ভিতরে সাদা, রান্না করে খাওয়া যায়। আলাদা ভাবে রোপন করতে হয়।

১৬. গাত্তুয়া আলু- লতা জাতীয় অনেক বড় গর্ত করে রোপন করতে হয়, চামড়া লালছে ভিতরে সাদা, রান্নাকরে খাওয়া যায়। আলাদাভাবে রোপন করা হয়।

১৭. জুম্ময়্যা মরিচ- ধান্নয়্যা মরিচ হিসেবে সর্বাদিক পরিচিত। আকারে ছোট ও ঝাল, আলাদাভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়।

১৮. মায়াশাক - পাতা সবুজ লালছে এবং লম্বা গোলাকার । সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়। শেষ বয়সে মূলা বিচির মতো হয়। আলাদাভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়।

১৯. পুসি শাক- দেখতে কিছুটা ধনে পাতার মতো। তরকারীতে সুগন্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। আলাদাভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়।

২০. অসউন শাক- সবুজ, পাতা গোলাকার, খেলে জিহক্ষা ঝিনঝিন করে। আলাদা ভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়।

২১. সাবেরেঙ (তুলসী)– ছোট। সবুজ, লাল-কালছে দুই জাতের হয়। তরকারীতে সুগন্ধীর জন্য ব্যবহার করা হয়। আলাদাভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়।

২২. কুরাঙা শমই- গাছটি লতা জাতীয়, সবুজ । চার সাইডে চ্যাপ্টা। সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়। আলাদা করে রোপন করতে হয়।

২৩. মা শমই - ছোট সবুজ, সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়। আলাদা করে রোপন করতে হয়।

২৪. জুম শমই- গাছ লম্বা, ছোট , সবুজ, সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়। আলাদা করে ছিটিয়ে দিতে হয়।

২৫. বিদুঙগুলা- গাছ ছোট , কাঁটাযুক্ত, ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ , পাকলে হলুদ। আলাদা করে ছিটিয়ে দিতে হয়।

২৬. আমিলা (পাতা/গুলা)– টক পাতা/গুলা হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। গাছ মাঝারী, শাক ও ফল সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। বীজ আলাদাভাবে সাধারণত পথের ধারে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

হয়। চিৎকার, পশুর মতো শব্দ ও জুমে ঘুরে ফিরে কিছু খাওয়া যায়না, এতে জুমের অমঙ্গল হয়।

২৭. চিইড়া- মারফা জাতীয় ফল, কাঁচা অবস্থায় কালছে সবুজ, পাকলে সুগন্ধি।

২৮. মক্কেয়্যা(ভূট্টা)- এটি জুমে একটি কমন ফসল। সাধারণত সারা জুমে আলাদা ভাবে রোপন করা হয়।

২৯. জুম্ময়্যা বেগুন- বেগুনটি ছোট, কচি অবস্থায় সবুজ পাকলে হলুদ, সিদ্ধ ও রান্না করে খাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্যেতন্‌চংগ্যা বারমাসিতে ধনপুদি যে তরকারি রান্না করে মূলত জুমে উৎপাদিত এই সবজি গুলিই।

৩০. জুম ফুল- জুমে উৎপাদিত ফুলের মধ্যে নানান রকমের রয়েছে। তাঁর মধ্যে 'জুম ফুল' অন্যতম। জুমফুল হচ্ছে মূলত গাদা ফুল। অন্য ফুল গুলি হলো - সোমাফুল, লো ছিত্তিয়াঙ, কদুর ফুল, একপাউজ্জ্যা ফুল, দ্বি-পাউজ্জ্যা ফুল। ফুলবীজগুলি মূলত জুমের পথের ধারে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আর এই ফুল নিয়ে তন্‌চংগ্যা সংস্কৃতিতে রচিত হয়েছে কত গান, সাহিত্য, রচিত হয়েছে উবাগীত, বারমাস, রাধামন-ধনপুদি পালা। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, তন্‌চংগ্যা মেয়েরা যেসব পোশাক হাতে তৈরী করে এবং পড়ে তার মধ্যে যেসব ফুলের কারুকাজ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর নামও জুমে উৎপাদিত নানা শস্য ফসলাদির বীজ ও ফুল থেকে নেওয়া। রাধামন ধনপুদির পালার-ধনপুদির পোশাকের মধ্যে আমরা এই ফুলের বর্ণনা গুলি পাই। যেমন- বেগুন বিচি ফুল, কুরা চোখ ফুল (মুরগি চোখের ফুল), গাইত ফুল (গাছ ফুল), কোই ফুল, বিসইন ফুল,সুইচ্ছ্যাং ফুল, কুরাঙা কাবা ফুল, কাঙারা বিচিফুল,কুমুড়া বুক্কয়্যা ফুল,মাম্মা বিচি ফুল,ধুদিপাল ফুল, আইদফুল, আয়াততলা ফুল, দিই হরা ফুল, বুল চোক্ষয়্যা ফুল।

জুমে ধানসহ সব কিছু শস্য,ফসলাদি রোপন করা হলো। কিছুদিন বিশ্রাম নেয়ার পর লক্ষীমা মিত্তিন্যাকে বলল , দেখতো গিয়ে জুমের অবস্থা কি রকম, ধান, শস্যাদি গজিয়েছে কিনা। সপ্তাহ দুয়েক পর মিত্তিন্যা জুমে গিয়ে দেখল, শস্যাদি বড় হয়েছে ঠিকই কিন্তু সাথে বাড়তি আগাছা থাকায় কেমন জানি বাড়তে পারছে না- লক্ষীমাকে এসে এই তথ্যাদি বলল। উত্তরে লক্ষীমা শুধু ঠিক আছে বলে দু একদিন পর লক্ষীমা বলল জুমে গিয়ে দেখ কি অবস্থা । তবে পশ্চিম দিকে যেও না। মিত্তিন্যা জুমে গিয়ে দেখল- একটাও আগাছা নেই। আর লক্ষীমা যেদিকে যেতে নিষেধ করেছে কৌতূহল বশতঃ সেদিকে গিয়ে শুনে কারা যেন কান্নাকাটি করছে। কাছে গিয়ে ভালোমতো লক্ষ্য করে একটি বড় পাথরের নিচে কারা যেন কাঁদছে। উল্টিয়ে দেখে জুমের সমস্ত আগাছা যা লক্ষীমা সবাইকে ডেকে পাথরের চাপ দিয়ে রেখেছিল। মিত্তিন্যা যখন পাথরটি তুলে দেখলো তখন সবি আবার জুমের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। লক্ষীমাকে এই কথা এসে বললে কিছু না বলে পরের দিন আবার আগের মতো ডাক দিলে অনেক আগাছা পূনরায় ফিরে আসেনি। এই আগাছা গুলি মূলত জুমের অন্যান্য ফসলের সাথে বড় হয়। তন্‌চংগ্যাদের জনশ্রুতিতে আছে যেগুলি লক্ষীমার ডাকে পূনরায় সাড়া দেননি বা ফিরে আসেননি তাদের দমন / পরিষ্কার করতেই জুমিয়াদের হাফিয়ে উঠতে হয়। এই নিয়ে সময় ও অর্থ উভয় অপচয় হয়। এই আগাছা গুলোকে

Scanned with CamScanner

জুমের ধান সাধারণত ভাদ্র–আশ্বিন মাসে পাকতে শুরু করে এবং অনেক সময় কাটাও শেষ হয়ে তন্চংগ্যা ভাষায় 'ক্ষের' বলে। এই ক্ষের গুলোর নামও রয়েছে, রয়েছে আকারও ধরণ-

১. দুসা রাঙা ক্ষের- গোড়াটা লাল , অনেক বড়, পাতা সবুজ ও লাল।
২. সুলুক্কেয়া- বড় , সবুজ কাঁটাযুক্ত , ফল হয়।
৩. লাসুরাপাদা- লজ্জাবতী পাতা হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। পাতা সবুজ, ফুল সাদা লালছে, পাতা ছোট ছোট পাপড়ি যুক্ত, কাঁটা আছে।
৪. মুনি পুজ্জ্যা - ছোট, পাতা সবুজ, ফুল হয়।
৫. টোয়াঙ গাইত- ক্ষেরটি বড়, অনেক উচু, পাতা সবুজ, ফুল হয়।
৬. আসাম লুদি- লতা জাতীয় ক্ষের, সবুজ, ফুল সাদা।
৭. বেল্ বন- কথিত আছে সূর্যের সাথে বন্ধুত্ব করে, সবুজ। রোদেও সহজে মরে না।
৮. টিক্ষা কারাং- ঘাস লম্বা , সবুজ, ফুল হয়।
৯. বাছালী - পাতাযুক্ত , মাটির ভিতর ফলটি থাকে, তাই সহজে মরে না।
১০. উবক লেরা- পাতা সবুজ, ছোট কাঁটাযুক্ত।
১১. বাউলী পাতা- পাতা ছোট সবুজ গোলাকার, পোড়া উঠলে পোড়ার মুখে লাগিয়ে রাখলে পেকে যায়।
১২. দোল্যা ক্ষের- পাতা সবুজ ছোট।
১৩. কুরাফুল ক্ষের - দেখতে অনেকটা মুরগীফুলের মতো , পাতাযুক্ত।
১৪. বাইজ্যা ক্ষের - লতা, পাতা সবুজ।
১৫. পাদুরা লুদি- গন্ধ বদালিও বলা হয়, লতা, পাতা সবুজ লালছে, গন্ধ।
১৬. জুনি ফুল ক্ষের – পাতা ছোট এবং সবুজ।
১৭. পঙ লুদি - লতা যুক্ত, পাতা সবুজ, মাটির ভিতর গোলাকার বড় বীজ থাকে, আলু থাকে।
১৮. বিস্সর্ব - পাতা ছোট, সবুজ, ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ।

ধানের গাছ অনেক বড় হয়েছে ফুলও আসতে শুরু করেছে, দু'একবার আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে , হয়তো দু'তিন সপ্তাহ পড়ে পাকতে শুরু করবে। এর মধ্যে জুমে নানান ফল, শাক-সবজি পাওয়া যাচ্ছে। যেগুলোর এর আগের পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রোপন করার মতো ধান কাটার সময়ও একই আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। লক্ষীমার জন্য রোপন করা ধানগুলো আগে কাটতে হয়। জুমে যখন ধানসহ নানা শস্যাদির ভরে উঠবে, তখন নানা অশুভ হাত থেকে জুমকে রক্ষা করার জন্য জুমিয়ারা 'কসই পানি ' নামক এক ধরনের পবিত্র পানি শনি ও মঙ্গলবারে বিকেল বেলায় জুমের মধ্যে ছিটিয়ে দেন। আর এই কসই পানির ছিটার পর নতুন করে জুম থেকে কিছুই ছেড়াঁ যায় না। কসই পানি সাধারণত হলুদ, ঘিলা, কসই, শন, সোনা/রূপা মিশ্রিত একটি পবিত্র পানি। ধান যখন পাকতে শুরু করে দিনে পাখি ও রাত্রে অন্যান্য পশুপাখি তাড়ানোর বা পাহারা দেওয়ার জন্য 'পাক্' নামক বাশেঁর তৈরী একটি যন্ত্র ব্যবহার করা

Scanned with CamScanner

যায়। তখন জুমিয়ারা দিনে এবং রাত্রে বিশ্রাম ও থাকার জন্য জুমঘর তৈরী করেন(জুমঘর অবশ্যই শুরুতেই তৈরী করা হয়)। এই জুমঘরের মধ্যে থেকে রাত্রে তারা জুম পাহারা দেন। তারা এই সময়- বাঁশি, দোদুক/ঢোল, পাঁক, বারমাসি/উবাগীত, বেহেলো বাজায়। জনশ্রুতিতে আছে পুরনো দিনে জুম ঘরের ইচরে বসে বারমাসী/ উবাগীত গেয়ে যখন জুম পাহার দেওয়া হয় তখন গ্রাম্য মেয়ে বেশ ধরে পরী মেয়েরা গান শুনতে আসে। আর এই জুমে রয়েছে নানা জাতের পোকা মাকড়। যেগুলি জুমের ফসলের অনেক ক্ষতি করে, শুভ-অশুভ ও ভাল মন্দ নানা সংকেত দেয়। এই পোকাগুলি হলো-

১. ফেরেঙ(ফড়িং)- এই ফড়িং ৪/৫ জাতের আছে, তিল্‌ল্যা , গাইত, কাইন, আইত, সুদা তোলা ফড়িং, এগুলো ফসলের অনেক ক্ষতি করে।
২. বিছা (বিচ্ছু)- বিচ্ছু আছে কয়েক জাতের। বিচ্ছুর কাটা বিষাক্ত এবং অনেকে এতে ভোগান্তির শিকার হন, তবু জুমিয়াদের তেমন মাথা ব্যাথা নেই। কারণ জুমেতে বিচ্ছু বেশী হলে দমন ফসলবা ধান ভালো হওয়ার লক্ষণ।
৩. নেয়ান পোক(ঝিঝি পোকা)- এই পোকা জুমিয়াদের উপকার ছাড়া ক্ষতি করেনা । বৈশাখ মাসে ডাকা মানে জানান দেয় সময় এসেছে জুমে কাজ শুরু করার, বিকেল বেলা ডাকা মানে বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে।
৪. গেরা- বেশী হলে জুমে ফসল ভালো হওয়ার লক্ষণ।
৫. তরুন পোক- ধানের কচি আগা ও শাক-সবজি খেয়ে নষ্ট করে দেয়।
৬. গুউরা- আছে কয়েক ধরনের। এরা ফসলের উপকার ও ক্ষতি উভয়ই করে।
৭. উদউন পোক- সন্ধ্যা সময় উড়ে। কালছে রঙ, ফসলের ক্ষতি করে।
৮. মামাক পোক- কালছে , ফসলের ক্ষতি করে।
৯. মিবা পোক- ছোট, কালছে , লম্বা, ধানের ক্ষতি করে।
১০. ফবাঙ- সবুজ, চ্যাপ্টা, ফসলের ক্ষতি করে।
১১. অরা পোক-সাদা , নরম। ফসলে তেমন ক্ষতি করে না।
১২. ইদুর - ফসলের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু করে না।
১৩. কেঁচো - কেঁচো বেশী হওয়া মানে ফসল ভালো হওয়ার লক্ষণ।
১৪. অরোউৎ- এক ধরনের ছোট পাখি। জনশ্রুতিতে আছে ধান খাওয়ার সময় সূর্যের দিকে তাকালে পূর্বে খাওয়া সব হজম হয়ে যায়।
১৫. মিবা পুক - এগুলো ধানের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কচি ধানকে চুসে খায় ফলে ধান চিটা হয়। এদের গায়ে উৎকট গন্ধও রয়েছে।
১৬. কুদুক (সজারু)- ফসলের ক্ষতি করে বিষেশ করে শাক-সবজির।

এছাড়া আরও অনেক পোকা-মাকড় ও পশু পাখি রয়েছে যেগুলো জুমের ফসলের অনেক ক্ষতি করে। পাখিদের মধ্যে ঘুঘু, টিয়া, চড়ই, অললক, সত্তাপাইত, বুলবুলি আর পশুদের মধ্যে হাতি, শুকর, সজারু, বানর, হরিণ। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে যখন ধান পাকতে শুরু করে। তখন ঘুঘু পাখির

Scanned with CamScanner

ডাক বেশী শুনা যায়। জনশ্রুতিতে আছে- ঘুঘু পাখি পাকা ধান দেখে তাঁর সন্তানের কথা মনে পড়ে ,কারণ তার ছেলে কাজের সন্ধানে অন্য জায়গায় । বিকেল বেলা যখন ঝিঙা ফুল ফুটে তখন জানান দেয় সময় হয়েছে বাড়ি ফেরার। পাখি ও মুরগি যদি ডানা শুকায় তাহলে বুঝবে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার লক্ষণ। জুম যখন শস্য ফসলে ফুলের গন্ধে ভরে উঠে তখন বাড়ির, গ্রামের যুবক-যুবতিরা মিলে তরকারী খুজতে যায় । জুম বেড়ানো বা রান্যা বেড়ানো নামে তন্চংগ্যা সমাজে উবাগীতের দুটি পর্ব আমরা দেখতে পাই।

জুমে ধান পেকেছে, লক্ষীমা মিত্তিন্যাকে বলল ধান কাটতে যেতে হবে এবং লক্ষীমা শিখিয়ে দিল কেমন করে কাঁটতে হবে। প্রথমে লক্ষীমার নামে যে ধানগুলো রোপন করা হয়েছিল আগে সেগুলো কাঁটতে হবে। লক্ষীমা মিত্তিন্যাকে আরও শিখিয়ে দিল ধান যেন বেশী করে পাই সেজন্য বলবে ও আগাদি ধা-লে গোড়াদি উদাক্, বামে ধা-লে ডানে উদাক্ সামনে ধালে পিছেদি উদাক। এই মন্ত্র পড়ে পরের দিন যখন মিত্তিন্যা ধান কাটতে শুরু করলো তখন দেখলো যেখানে কাটে সেখানে আবার নতুন করে ধান জন্ম হয়। উল্লেখ্য তন্চংগ্যারা জুমে প্রথম ধান কাটতে গিয়ে উল্লেখিত মন্ত্রটি এখনো পড়ে। পরে মিত্তিন্যা রাগে কাঁচি দিয়ে গোঁটা দিলে বাড়ি এসে দেখে লক্ষীমা জ্বরে কাটরাচ্ছে। মিত্তিন্যা জিজ্ঞাস করতে লক্ষীমা বলল তুমি আমাকে কাঁচি দিয়ে আঘাত করেছ। মিত্তিন্যা মনে মনে ভাবল কই আমি তো ধানগুলোকে রাগে কাঁচি দিয়ে আঘাত করেছি, লক্ষীমাকে তো করিনি। তারপরের ঘটনা মিত্তিন্যার আর বুঝতে বাকি রইল না। জুম কাটা, জুম পরিষ্কার, সাপ, আগাছা পরিষ্কারসহ সব ঘটনা সে বুঝতে পেরেছে আসলে লক্ষীমার অলৌকিক শক্তির স্পর্শে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। জুমের প্রতিটি ঘটনায় ফসল, শস্যের প্রতিটি দানায় লক্ষীমার স্ব-প্রতিভ উপস্থিতি এবং এগুলি স্বয়ং লক্ষীমার ছায়া এবং আত্মা মনে করছে মিত্তিন্যা । জুমের ধান কাটা শেষ হলেও অন্যান্য ফসলাদি পরবর্তী জুমচাষ সময় পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়।

জুমচাষের সাথে যেসব যন্ত্রপাতি ও উপকরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সেগুলো হলো–

ক. টাঅল (দা)
খ. পাঅরা
গ. খন্দা (বল্টু)
ঘ. করোল (কুড়াল).
ঙ. চারি (কাঁচি)
চ. কুরোম (ছোট ঝুড়ি)–ধান রোপন করার কাজে ব্যবহার করা হয়।
ছ. কাঁসা–কুরোমের চেয়ে একটু বড় ঝুড়ি।
জ. কাল্‌লাঙ / পুইল্‌লাঙ – কাঁসার চেয়ে বড় ঝুড়ি, যেটা দিয়ে ধান কাটা হয়।
ঝ. দিইরা – কাল্‌লাঙ /পুইল্‌লাঙ চেয়ে বড় ঝুড়ি, ধান কাটার পর যেখানে কাটা ধান জমা রাখা হয়।
ঞ. বারেং–অনেক বড় ঝুড়ি, যেখানে মাড়াই করা ধান জমা রাখা হয়।

Scanned with CamScanner

এই জুমকে কেন্দ্র করে যে পূজা পার্বনগুলি হয় সেগুলো সাধারণত পরিবার কেন্দ্রীক, অনেক সময় সামাজিক ভাবেও হয় সামার্থ্যনুসারে। ধান রোপন ও কাটার জন্য পূজা দেওয়া হলেও মূলত ধান কাটা শেষ হলে শুরু হয় আসল অনুষ্ঠান- নয়াভাত (নতুন ভাত) খাওয়া মানে নবান্ন উৎসব। এতে পাড়া-প্রতিবেশী , আত্মীয় -স্বজনদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয় রাতভর চলে গিংগুলী (উবাগীত) গানের আসর। বিহার থেকে ভিক্ষুদের ফাঙ্ করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'মিত্তিনী' (মাটি) পূজা বলা হয়। এই নতুন ভাতের আয়োজনের, আনন্দের মধ্যে দিয়ে তন্‌চংগ্যাদের সর্বপুরী জুমিয়াদের জুমসংস্কৃতির পরিপূর্ণতা লাভ করে। মিত্তিনি পূজার সময় দা, কুড়াল, পাঅরা, খন্দা ও কাঁচিকেও এই উৎসবে সম্পৃক্ত করা হয়। প্রতিকীভাবে তাদেরকেও আপ্যায়ন করা হয়। তন্‌চংগ্যারা বিশেষ করে জুম চাষে তাদের অবদানও কোন অংশে কম নয়। পরবর্তীতে পুরানো অবহেলায় পড়ে থাকা জুমকে তন্‌চংগ্যা ভাষায় রান্যা বলে তবে এই রান্যা থেকে কিছু সবজি পাওয়া যায়। এভাবেই তন্‌চংগ্যাদের এক বৎসরের জুমসংস্কৃতির সমাপ্তি ঘটে আবার আগামী বৎসরের আশায়।

এভাবে লক্ষীমা মানব কুলকে বাঁচানোর জন্য যে স্বপ্ন, আশা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই বসুমতিতে এসেছিলেন জুম চাষের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। মানব কুলকে এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা উপায় দেখিয়ে এবং তৈরী করে দিয়েছেন। লক্ষীমার এই স্বপ্ন ও আশাকে তন্‌চংগ্যারা এখনো প্রত্যেক পরিবারে লালন করে। তারা জুমে উৎপাদিত প্রতিটি শস্যের মধ্যে লক্ষীমার উপস্থিতি আছে বলে বিশ্বাস করে। সেজন্য তাঁর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রেখে তন্‌চংগ্যারা অনেকে তার নামে পূজা দেয় এবং ভক্তি করে। এভাবে লক্ষীমার আর্শীবাদকে বুকে, স্বপ্নে লালন করে তন্‌চংগ্যারা প্রত্যেক বছর শুরু করে জুম কাটার আয়োজন, জুম সংস্কৃতির নির্মাণ।

জনশ্রুতিতে আছে লক্ষীমা মানব কুলকে বাঁচার পথ দেখিয়ে দিয়ে পুনরায় তার স্থানে ফিরে যাননি এবং ফসলের বীজগুলিও ফিরিয়ে নেননি, তন্‌চংগ্যারাও তা বিশ্বাস করে। কারণ তিনি চলে গেলে 'ভাগ্য লক্ষী' বলে আর কিছুই থাকবে না। সেজন্য পৃথিবীতে যতদিন ধনসম্পদ ঐশ্বর্য্যের চাহিদা থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে তার উপস্থিতি এবং বিচরণ থাকবে। কারণ এগুলির মালিক স্বয়ং তিনি নিজে এবং তিনিও আমাদের সাথে একজন পৃথিবীর বাসিন্দা।

Scanned with CamScanner

বিজয়গিরি

শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

পুরুষ চরিত্র পরিচয়

উদয়গিরি = চম্পক নগরের রাজা
বিজয়গিরি = ঐ জ্যৈষ্ঠ পুত্র
সমরগিরি = ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
কালাবাঘা = ঐ মন্ত্রী
রাধামোহন = যুবরাজ বিজয়গিরির সেনাপতি
কুঞ্জধন = উদয় পুরের সেনাপতি
জয়মানিক্য = উদয় পুরের রাজা।
অমর সিংহ = ঐ মন্ত্রী
কালঞ্জয় = পাহাড়ী জংলী রাজা
লাংদেং = জংলী সর্দ্দার
মঙ্গল রাজা = রোয়াং দেশের রাজা
সয়ব্রাং = ঐ সেনাপতি
চন্দ্র সুরিয় = ব্রহ্মদেশের রাজা
বোক্য = ঐ সেনাপতি
ঐ মন্ত্রী
ছলারবাপ = রাধামোহনের মাতামহঃ বৃদ্ধ
নাগরিকগণ, ব্রাহ্মণ গণ, বিবেক সৈন্যগণ

নারী চরিত্র

ধনপতি = রাধামোহনের স্ত্রী
কুঞ্জুবী = ঐ সহচরী
আরিস্বর্ণ ময়ী = ব্রহ্মরাজ কুমারী
সখীগণ প্রভৃতি।

প্রস্তাবনাগীতি

সাম্যকণ্ঠে সাম্য ছন্দে
গাওরে সকলে সাম্যগান।
বিশ্বের বক্ষ কাঁপিয়ে মেদিনী,
সাম্যমন্ত্রে ধরহে টান।
মানবতা যার প্রাণের দেবতা,
সত্য যার বিজয় বারতা,
ভীরুতা হীনতা দলে পদতলে,
আনরে বিশ্বে মৈত্রীগান।
আকাশে বাতাসে–সাম্য গীতিকা,
করো–ঘোষণা–সাম্য অমরতা,
ভেদা ভেদ ভুলি হওরে একতা,
গাওরে আবার–সাম্য মৈত্রী গান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান ঃ চম্পক নগর রাজসভা
(রাজা উদয়গিরি ও কালাবাঘার প্রবেশ)

উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রীবর
ধনধান্যে পরিপূর্ণ
এই চম্পক নগর।
ষড়ঋতু বিরাজিত–
প্রকৃতির লীলা নিকেতন,
সুজলা–সুফলা–বন–উপবন,
ফলে ফুলে–শ্যামল বনানী,
গাছে শাখে– বিহগ–বিহগিনী
আনন্দে গাহে গান।
বসি এ রাজ সিংহাসনে–
রাজ্য আমি করিতে শাসন
বল মন্ত্রী! প্রজা পূঞ্জগণ।
কোন দুঃখ দৈন্য আছে কিনা।

কালাবাঘা ঃ মহারাজ!
পুত্র সম প্রজাগণ, করেন পালন,
আপনার সুশাসনে–
এই চম্পক নগরে,
রাজ্য বাসীগণ আনন্দ হিল্লোলে–
বিরাজিত মহাশান্তি ক্রোড়ে–

Scanned with CamScanner

মাতৃ ক্রোড়ে দুগ্ধ পোষ্য শিশু সম।
রাজ্যে নাই কোন দুর্ভিক্ষের হাহাকার,
মহামারী করাল ছায়া চিহ্ন আর–
নাহি কেহ অনাহার–
প্রজাপুঞ্জ সবে– সুখে করে বাস।
উদয়গিরি ঃ মন্ত্রীবর। সত্য বটে।
পালি আমি– দশরাজ ধর্ম নীতি।
আর পঞ্চশীল ধর্ম।
তাই মম সুশাসনে–
রাজ্যে যত সুখী প্রজাগণ।
কিন্তু ! আমি আজ!
উপনীত বার্দ্ধক্য দশায়,
হয়েছে উপযুক্ত দুই পুত্র মম–
বিজয়গিরি আর সমরগিরি,
শৌর্যে বীর্যে পরাক্রম–
অস্ত্রে শস্ত্রে সংগ্রামে নিপুন।
কালাবাঘা ঃ মহারাজ!
নাহি কিছু চিন্তার কারণ–
উজ্জ্বল তারকা সম–
যুবরাজ দুই, সমরে নিপুন,
যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী অতি।
যদি কোন বহিঃ শত্রু এসে–
এ রাজ্যে করে আক্রমণ,
অবহেলে শত্রুগণ–
অতি শীঘ্র করিয়ে নির্মূল
নর্বিঘ্নে রক্ষিবে–
এই চম্পক নগর।
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রী বিচক্ষণ!আমি করেছি –চিন্তন,
মম জ্যৈষ্ঠ পুত্রে–দিয়ে রাজ্যভার–
রাজকার্য হতে অবসর নিব আমি।
এই বার্দ্ধক্য সময়ে
সাধন ভজনে শীলাদি পালনে,
শ্রীবুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে–
বাকী দিন করিব যাপন।
কালাবাঘা ঃ মহারাজ! উত্তম প্রস্তাব
যুবরাজ বিজয়গিরি–
হবে রাজা চম্পক নগরে।
এ শুভ সংবাদ করিতে প্রচার–
রাজ্যময় করিব ঘোষণা।
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রীবর!
আমার জীবিতকালে
জ্যৈষ্ঠপুত্র মম–
নিবে কিনা – রাজ্যভার–
কিছুদিন করিয়ে চিন্তন,
তার পর করিব বিধান।
কালাবাঘা ঃ মহারাজ!
অগ্রে করিয়ে চিন্তন–
যাহা কর্ম করিতে সাধন–
কহে বিজ্ঞগণ।
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রী! বিচক্ষণ!
সত্য বটে! জ্ঞানীর লক্ষণ–
অগ্রে করিয়ে চিন্তন–
করিতে সংকল্প সাধন।
মহাজ্ঞানী মহাজন–
তাদের বচন।
চল এখন
বিশ্রাম আলয়ে।
(উভয়ে প্রস্থান)
(বিজয়গিরি একাকী প্রবেশ)
বিজয়গিরি ঃ চম্পক নগরের রাজপুত্র আমি!
করেছি যৌবনে পদার্পন।
ক্ষত্রিয় বীর রক্তে জনম আমার!
শিখেছি রণ বিদ্যা–যুদ্ধের কৌশল।
সেই ক্ষত্রিয় বীর রক্ত–

Scanned with CamScanner

তেজোদীপ্ত –নব বল–
প্রবাহিত মম এই বাহু ধমণীতে।
সংকল্প জাগে আমার–
বাহুবলে যদি করি দিগ্বিজয়
রহিবে জগতে মম–
সেই বীর কীর্ত্তি গাথা।
গাহিবে বিশ্ববাসী–
মম জয় গান।
হবো আমি দিগ্বিজয়ী বীর।
(রাধামোহন প্রবেশ)
রাধামোহন ঃ যুবরাজ!
একা কেন তুমি–
কিবা চিন্তায় তন্ময় এখন–
জানিতে পারি কি আমি?
বিজয়গিরি ঃ শুন! প্রাণ সখা!
সাগরের ঢেউর মত–
কত চিন্তা জাগে মনে,
চাও যদি তুমি–জানিবারে–
মম গোপন বারতা।
শুন তবে।
মম পূর্ব বংশধর
পিতৃ পিতামহ রাজা ভীমঞ্জয়,
ছিল ক্ষত্রিয় বীর যোদ্ধাপতি,
তাঁর পূর্ব পূর্ব বংশধর
প্রবল প্রতাপ চম্পক কলিরাজা।
যাহার স্মরণে এই চম্পক নগর,
বাহুবলে এই রাজ্য করিয়ে বিজয়–
বিরচিত বিশ্ব বক্ষে অমর গড়িমা।
সেই বীর বংশে জনম আমার –
বাহুবলে দিগ্বিজয়–
করিতে বাসনা।
বল সখা! বল
তব কিবা অভিপ্রায়।
রাধামোহন ঃ যুবরাজ!
মম অভিমত–কি দিব উত্তর।
প্রতিদ্বন্দী বিনা– কার সনে–
করিবারে রণ– হবে অগ্রসর।
বিজয়গিরি ঃ সত্য বটে! কিন্তু
বীর জাতি মোরা–
সময় সুযোগ আসিবে যখন,
দিগ্বিজয়ে হইব বাহির।
শৌর্য বীর্য পরাক্রম–
করি প্রদর্শন, হয়ে রণজয়ী–
হবো আমি দিগ্বিজয়ী বীর।
রাধামোহন ঃ যুবরাজ!
বীরোচিত সংকল্প তোমার–
তব তেজোদীপ্ত বীরত্ব বাণী–
যৌবনের উৎসাহ উদ্দীপনা
প্রশংসা করি শতবার।
যদি আসে সেই সু সময়–
সূবর্ণ সুযোগ;
তখন তব বাহুবল–
কত শক্তিধর–
রণক্ষেত্রে দিবে পরিচয়।
বিজয়গিরি ঃ উত্তম কথা।
সময়ের হবে প্রয়োজন!
মনের সংকল্প করিতে পূরণ।
রাধামোহন ঃ যুবরাজ!
তব পূর্ব বংশধর–
মহারাজ চম্পক কলি–
প্রবল প্রতাপে–
এই চম্পক নগর–
করেছেন পত্তন,
ক্ষত্রিয় বীর বংশধর–

সেই চম্পক কলির–
বংশধর তুমি।
বিজয়গিরি ঃ রাজা চম্পক কলি,
এই রাজ্য করিয়ে বিজয়–
তাঁরি নামে এই চম্পক নগর,
বাঞ্ছিত আমার জীবনে যাহা–
সুযোগ সময়ে আমি
হবো অগ্রসর সংকল্প সাধনে
চল আজ!
(উভয়ে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য
স্থান ঃ চম্পক নগর রাজসভা
(উদয়গিরি ও কালাবাঘাপ্রবেশ)
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রীবর!
পদ্মপত্র – নীর–অন্তর অধীর,
বহে যায়– পলে–পলে দিন;
ফিরে চলে গতি–
কালের কুটিল চক্র।
কে বলিতে পারে–
এই পুরাজীর্ণ– বার্দ্ধক্য বয়সে,
কতদিন আর ধরা ধামে আমি
এই দেহ লয়ে রহিব বাঁচিয়া।
মম জ্যৈষ্ঠ পুত্রে দিয়ে সিংহাসন,
রাজকার্যে আমি
এইবার লইব বিশ্রাম।
অভিপ্রায় মোর–জ্যৈষ্ঠপুত্রে করহ জ্ঞাপন।
কালাবাঘাঃ মহারাজ! এ শুভ সংবাদ–
করিতে জ্ঞাপন, শীঘ্র আমি–
যুবরাজে করিয়ে আহ্বান–
আনাইব এই রাজসভা মাঝে।
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রী বিচক্ষণ।
বহুদিন করেছি চিন্তন,
বিলম্ব নাহিক কারণ–
শুভদিনে শুভক্ষণে–
এই রাজ সিংহাসন,
জ্যৈষ্ঠ পুত্রে করিব অর্পন।
কালাবাঘাঃ মহারাজা! হইবে উত্তম
জানিয়ে প্রথম–করি জিজ্ঞাসন
যুবরাজ কি অভিপ্রায়।
উদয়গিরি ঃ মন্ত্রীবর! শুভস্যং শীঘ্রং
অশুভস্যং কাল হরণং।
(বিজয়গিরি প্রবেশ)
(পিতার চরণ বন্দনা করিয়া)
বিজয়গিরি ঃ কি বা প্রয়োজনে–
পিতঃ করিলে স্মরণ!
কি আদেশ করিব পালন–
বল পিতঃ!
তব অভাগা সন্তানে।
উদয়গিরি ঃ শুন বৎস!
মম অভিলাষ;
উপনীত আমি জ্বরাজীর্ণ–
বার্ধক্য শরীরে;
শক্তি মোর হয়েছে শিথিল।
কত দিন আর বসি সিংহাসনে–
রাজকার্য করিব পালন।
তাই ভাবিতেছি মনে
জ্যৈষ্ঠ পুত্রে দিয়ে রাজ্যভার,
রাজকার্যে অবসর করিব গ্রহণ।
বল বৎস!
কি বা অভিপ্রেত তব।
বিজয়গিরি ঃ পিতঃ তব আদেশ–
পারিবনা কভূ– করিতে লজ্মন।
কিন্তু ! পিতঃ–মনে মনে আমি–

সংকল্প করেছি গ্রহণ,
যতদিন পিতঃ রহিবে জীবিত,
ততদিন তব অভাগা সন্তান-
পরীক্ষা করিতে বাহু শক্তি বল,
শৌর্য-বীর্য পরাক্রম,
দিগ্বিজয়ে হইব বাহির।
ক্ষত্রিয় বীর রাজবংশে-
জনম আমার।
বাহু বলে ধরাতলে-
হতে চাই দিগ্বিজয়ী বীর।
তবে পিত: তব আজ্ঞা করিতে পালন,
চিন্তা করিবারে - দাও মোরে কিছু দিন
সময় -এখন।
উদয়গিরি ঃ বৎস! উত্তম সংকল্প তোমার।
ক্ষত্রিয় বীর বংশে-
জন্মিয়াছ তুমি,
বীর রক্ত প্রবাহিত শিরায় শিরায়,
তোমার বাহু ধমণীতে।
ভেবে চিন্তে করিও উত্তর।
কালাবাঘা ঃ মহারাজা! উত্তম প্রস্তাব!
ভেবে চিন্তে যুবরাজ-
করিবে উত্তর।
করিয়ে চিন্তন-কর্তব্য সাধন,
করে বিচক্ষণ, জ্ঞানীর লক্ষণ।
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রীবর!
যুবরাজ-সংকল্প মহান,
ক্ষত্রিয়-বীর সন্তান,
উপযুক্ত চিন্তা ধারা-
কল্পনী তাহার।
(গীতকণ্ঠে বিবেক প্রবেশ)
ভেবে চিন্তে করবে- রে কাজ-
এ ভব-সংসার।

কর্ম করে - পাছে যেন
ভাব্‌তে হয়না-পুনঃ বার।
চিন্তাধারা-ভাবনা যত-
মনের মধ্যে অবিরত-
সাগরের ঢেউর মত-
করবে মনে একটি সার।
(বিবেক প্রস্থান)
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রী বিচক্ষণ;
সময়ের হবে প্রয়োজন,
করিতে চিন্তন, যুবরাজ এখন।
কালাবাঘা ঃ মহারাজ!
যুবরাজ-আরও কিছুদিন-
ভেবে-চিন্তে-দিবেন উত্তর।

উদয়গিরি ঃ (বিজয়গিরির প্রতি)
যাও বৎস!
কিছু দিন পরে-
ভেবে চিন্তে মনে-
তব অভিপ্রায় বলিও আমায়।
বিজয়গিরি ঃ পিত: !
তব আজ্ঞা করিত পালন-
ভাবিয়ে উত্তর আমি-
করিব প্রদান।
(বিজয়গিরি-পিতাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান)
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রীবর।
জানি আমি
যৌবনের প্রথম বসন্তে-
যাগে মনে রঙিন কল্পনা-
জাগে মনে নব উদ্দীপনা।
জাগে মনে নূতন প্রেরণা।
কালাবাঘা ঃ সত্যবটে! মহারাজ!

Scanned with CamScanner

সেই কল্পনা-সেই উদ্দীপনা-
সেই প্রেরণা- যোগায়ে দেয়-
ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মধারা।
উদয়গিরি ঃ কর্মময় জীবন বড় বিচিত্রময়।
তাই মানুষ ভাবে একরকম,
হয় অন্য রকম।
দুই পুত্র আমার-
বিজয়গিরি আর সমরগিরি
কে জানে কার ভাগ্যে-
কিবা আছে।
এবার চল বিশ্রাম করিব।
(উভয়ে প্রস্থান)
নাগরিক ঃ (একজন ব্রাহ্মণ-একজন নাগরিক প্রবেশ)
আরে- বামুন ঠাকুর!
কোথায় ভিক্ষায় গেছিলেন নাকি?
ব্রাহ্মণ ঃ আরে-তা-বলতে হবে নাকি?
আমি বামুন মানুষ- পাড়ায়।
পাড়ায় ভিক্ষে করি -আর-
গনা পড়া কিছু-কিছু করি-।
নাগরিক ঃ আ-রে বামুন ঠাকুর!
তা-হলে বলুন তো-
বৎসরের ফলাফল কি?
ব্রাহ্মণ ঃ তা-হলে তো-বাপু!
গনা পড়া দেখ্‌তে হলে
বামুন ঠাকুরের-কিছু-
দক্ষিণা তক্ষিণা-বাপু।
নাগরিক ঃ আরে বামুন ঠাকুর!
আগে গনে পড়ে দেখ-
বৎসরের ফলাফল-
কেমন হবে। তারপর-
দক্ষিণা-তক্ষিণা পাবে।
ব্রাহ্মণ ঃ আরে তা-হলে শুন বাপু!

(পঞ্জিকা বাহির করিয়া)
রবি-ছয়, সোমে পনর,
মঙ্গলে আষ্ট, বুধে সতর।
শনি দশ, বৃহস্পতি উনিশ,
রাহুবার-শুক্র একুশ।
নাগরিক ঃ আরে বামুন ঠাকুর।
ঐসব কি বলছো-একটু
ভাল করে বুঝায়ে-সুঝায়ে
আমাকে বল না।
নতুবা দক্ষিণা তক্ষিণা পাবেনা।
ব্রাহ্মণ ঃ আরে-তা-হলে শুন বাপু।
আগে-গনা পড়া করে -গ্রহ গনের
শুভাশুভ অবস্থান দেখতে হবে।
তা-না হলে বৎসরের ফলাফল
কেমন করে বলব বাপু।
নাগরিক ঃ আরে-বামুন ঠাকুর!
তা-হলে ভাল করে-
গনা পড়া করে-দেখ।
ব্রাহ্মণ ঃ আরে-তা-হলে শুন বাপু!
মেষে-রবি-শুক্র, মিথুনে চন্দ্র-গুরু,
মীনে কেতু বুধ- এবং কর্কট, সিংহ-
ও কন্যায়-যথাক্রমে
মঙ্গল, শনি ও রাহুর অবস্থান।
তা-হলে শুন বাপু!
গ্রহ গনের স্থান ভাল দেখা যাচ্ছে না
মঙ্গল-শনি-রাহু গ্রহ।
নাগরিক ঃ আ-রে বামুন ঠাকুর!
আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।
শনি-মঙ্গল-রাহু-গ্রহ।
ব্রাহ্মণ ঃ আরে-তা-হলে শুন বাপু!
গ্রহ গণের অবস্থান শুভ নয়;
তাই-রাজ্যের মধ্যে-রাজাগণ

Scanned with CamScanner

যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।
বুঝলেন বাপু!
নাগরিক ঃ আরে–বামুন ঠাকুর।
তা–হলে তো–বৎসরের ফলাফল
ভাল নয়। রাজ্যে যদি–
রাজাগণ যুদ্ধ করলে–
তা–হলে তো– প্রজাগণ–ও
লড়ায়ে যেতে হবে।
আরে বামুন ঠাকুর!
চলুন–চলুন–।
(উভয়ে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য
স্থান ঃ রাধামোহনের গৃহ
(রাধামোহন ও ধনপতি প্রবেশ)
রাধামোহন ঃ ওগো প্রিয়তমে!
যতদিন তোমায়–
পারিনি করিতে আপন,
শুধু–শূণ্যময় হেরিতাম–
এই সুন্দর ধরণীতল।
যেথা যায় আমি–
শূণ্য প্রাণে–মুরু তৃষালয়ে বুকে–
শূণ্য হিয়ায়।
শুনিতাম জীবন হিল্লোল্ ।
কুরঙ্গ–কুরঙ্গিনী সনে,
ভ্রমিত অদূর বনে।
বিহগ–বিহগিনী–বৃক্ষ ডালে বসি
আনন্দে গাহে গান।
হিল্লোলিত কুসুমরাজি–
মলয় মারুতে,
ভাবি শুধু–আমি বড় একা–
এই বিশাল ধরণী বুকে।
আজ তুমি এসে–
সেই মম শূণ্য হিয়া–
করিলে পূরণ।
ধনপতি ঃ প্রাণ নাথ! মনে পড়ে সেই
দিন– যৌবনের প্রথম বসন্তে,
সাগরের পাড়ে মোরা দুইজন,
দেবের বাঞ্চিত সেই–
সরগের পারিজাত পুষ্পসম–
নাগেশ্বর পুষ্প আহরণে,
গিয়েছিনু যবে।
গাঁথিয়া সেই –নাগেশ্বর–
ফুলের মালা তব গলে দিয়ে।
পতিরূপে তোমায় আমি
করেছি বরণ।
রাধামোহন ঃ শুন প্রিয়তমে!
তুমি সেইদিন–ভালবেসে মোরে–
দিয়েছিলে –মম গলে–
নাগেশ্বর ফুলের মালা।
যৌবনের নব বসন্তের প্রারম্ভে,
সেই শুভক্ষণে মধুর লগনে
হল যবে তব সাথে–
মম পরিচয়,
সেই দিন তর রূপ দরশনে–
আত্ম হারা–মুগ্ধ আমি।
যেন কত জনমের–সেই
ছিল পরিচয় তব সাথে মোর
নয়নে হেরিয়া– সেই রূপের মাধুরী–
যতবার দেখি–তৃপ্তি নাহি মিটে–
নয়নে আমার।
শুধু তব পানে হেরি
নাহি মিটে সাধ–
অপরূপ তুমি প্রিয়ে।
ধনপতি ঃ শুন প্রাণ নাথ!

দিন মনি বিনা–
নলিনী যেমতি বিমলিনী,
একাকিনী কাঁদে বালা–
হেরি ভানু প্রফুল্ল বদন,
রজনীর জ্বালা–জানাইতে নাহি পারে
তেমতি হে–প্রিয় আমি–
হেরিলে তোমায়–
ভুলে যায় সব,
কি অভাব আছে প্রাণে।
যৌবন প্রথম ক্ষণে–
তোমারে বাসিয়ে ভাল,
ভাবিনি আর অন্য কোনজন।
দিবস রজনী–শুধু আমি–
রঙিন স্বপ্নের জাল বুনি–
কবে–হবে তব সাথে
মিলন বাসরে।
রাধামোহন ঃ ওগো– চন্দ্রাননী
প্রিয়তমা সতী–আনন্দদায়িনী,
মম হৃদয় সিংহাসনে–
তুমি অধিকারিনী।
তব–প্রেম ভালবাসা
নহে কভূ ক্ষণিকের তরে
কতযুগ ধরে–তুমি
বাঁধিয়াছ মোরে–
প্রেমের বাঁধনে।
কতজনমের ছিলে–
তুমি মম প্রিয়া।
(বৃদ্ধ ছলারবাপ প্রবেশ)
ছলারবাপ ঃ হাঁ– হাঁ– হাঁ– হাঁ– এই সুবণ
সুযোগে আমি এসে পড়লাম।
আমার দাদু আর দিদিকে –দেখতে।
নূতন প্রেমের জোয়ার খেলছে নাকি?

(রাধামোহন ধনপতি উভয়ে ছলারবাপকে প্রণাম জানাইল)
রাধামোহন ঃ দাদা ঠাকুর এই বেলা–
বহুদিন পরে হলো– দেখা।
ছলারবাপ ঃ বল দাদা বাবু – তুমি
আমার দিদির সাথে
কিসের আলাপ জমে ছিলে।
ধনপতি ঃ দাদা–ঠাকুর–বলুন তো!
যৌবন কালে
আমার নানু দিদির সাথে
কতইনা মধুর আলাপন
জমিয়ে দিতেন না?
ছলারবাপ ঃ হাঁ– দিদি মনি–!
প্রেমের আলাপ।
রসের আলাপ – আর–
ভালোবাসার আলাপ।
রাধামোহন ঃ আচ্ছা দাদা ঠাকুর!
আমার ঠাকুর দিদিকে
খুব ভালোবাসতেন নাকি?
ছলারবাপ ঃ ভালবাসি মানে–
একেবারে প্রাণঢালা ভালোবাসা।
ঠিক তোমাদের মত একদিন–
আমার যৌবন কালে যখন–
তোমাদের ঠাকুর দিদির সাথে
প্রেমালাপ– রসালাপ–
জমিয়ে দিয়েছি–
এমন সময় হঠাৎ আমার
ঠাকুর দাদা– সভায় উপস্থিত।
ধনপতি ঃ তর পর কি – হলো?
ছলারবাপ ঃ তারপর– তিনি কি বললে
জান আজ কেন গো কুঞ্জবনে,
রাধা–কানু– একাসনে।
আচ্ছা! এবার আমি যাই।

Scanned with CamScanner

হঠাৎ এসে – তোমাদের–
প্রেমালাভ ভেঙ্গে দিলেম।
রাধামোহন ঃ দাদা ঠাকুর! আপনাকে এখন যেতে নাহি দিব।
ছলারবাপ ঃ যদি আমায় যেতে নাহি দিবে।
তা–হলে করে ফেল এবার–
তোমাদের নব দম্পতির চুমুলাঙ।
ধনপতি ঃ দাদা ঠাকুর! এখন হঠাৎ
চুমুলাঙের ওঝা– পাব কোথায়?
ছলারবাপ ঃ নব দম্পতির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান
অতি শীঘ্র করা উচিত।
শুভস্যাং শীঘ্রং বুঝলি।
সহসা গুরুজনদের আশির্বাদ–
নিতে হবে– যে।
রাধামোহন ঃ দাদা ঠাকুর! তা–হলে
আমাদের সেই মাঙ্গলিক
অনুষ্ঠান– চুমুলাঙ করতে–
আপনাকে– ওঝা গিরি
অর্থাৎ পৌরহিত্য করতে হবে।
ছলারবাপ ঃ আমি বুড়ো মানুষ–
আর কি – করি।
দাদা ও দিদির আগ্রহ–
আমি কি অবহেলা করতে পারি।
এরকম নবদম্পতির কত চুমুলাঙ্
আমি করে দিয়েছি।
তবে বুড়ো– হলেম কিনা!
চুমুলাঙের –ওঝা গিরি–
করতে করতে – আমার
চুল–দাড়ি–সব পেকে গেছে।
ধনপতি ঃ আচ্ছা দাদা ঠাকুর! বলুন তো
আপনি কি আমার দিদির প্রেমে পড়েছেন।
নাকি আমার দিদি আপনার প্রেমে পড়েছে?

ছলারবাপ ঃ নারী হলো ফুল– আর
পুরুষ হলো ভ্রমরা।
তাই ফুলের গন্ধ যেখানে পায়–
ভ্রমরা সেখানে উড়ে যায়।
তখন ফুলের মুধু খায়।
আচ্ছা– আজ অনেক বেলা হলো
আগামী দিন –তোমাদের চুমুলাঙ
করে দেব। চল এখন।
(সকলে প্রস্থান)
(ধনতি ও কুঞ্জবী প্রবেশ)
ধনপতি ঃ শুন ওগো সখি!
করেছি মানস আমি–
ভগবান শ্রীবুদ্ধ মন্দিরে,
পাই যদি মনোমত পতি,
বাসন্তী পূর্ণিমা তিথি–
ধুপ–দীপ–পুষ্পে–
পূজাদিব–প্রভূর চরণে।
কুঞ্জবী ঃ ওগো–সই!
তুমি মহা ভাগ্যবতী–
দেব তুল্য–স্বামী তব,
কয় জনের ভাগ্যে জোটে বল!
ধনপতি ঃ শুন সখি। আমার গোপন
কথা– বলিনি কাহারে আজো।
কিঞ্চিৎ মাত্র জান তুমি সখি,
তুমি আমার অন্তরঙ্গ বলে।
তব কাছে–প্রকাশ করেছি আমি।
বল সখি? মম সাথে তুমি–
মানস পূজিতে–শ্রী বুদ্ধ মন্দিরে,
যেতে পার কবে!
কুঞ্জবী ঃ শুন সই!
আগামী বাসন্তী পূর্ণিমাতে–
পূজাদিতে পার শ্রীবুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে

(রাধামোহন প্রবেশ)
রাধামোহনঃ শুন ওগো প্রিয়ে!
দুই সখি মিলে–
কিবা আলাপন–
কিছের গোপন– কহ দুইজন
শুনিতে কি পারি আমি!
কুঞ্জুবী ঃ বড় গোপন কথা–
শুনিতে বাসনা যদি–
কোন বাধা নাই–
সখি কাছে কর জিজ্ঞাসন।
রাধামোহন ঃ ওগো– সুবদনি!
জীবন সঙ্গিনী–প্রেম সোহাগিনী
মম অর্দ্ধাঙ্গিনী!
কিছের গোপন, কি তব বাসনা,
বল ওগো–মোরে!
ধনপতি ঃ শুন প্রাণ –নাথ!
করেছি–মানস আমি–
কুমারী বয়সে, মানস পূজিতে–
ভগবান শ্রী বুদ্ধ মন্দিরে।
আজি পূর্ণ সেই মনস্কাম,
পূজিবারে তাই বাসন্তী পূর্ণিমায়
সখি সনে করি আলাপন।
বল প্রিয়তম–তব কিবা অভিপ্রায়।
রাধামোহন ঃ শুন প্রিয়তমা!
করিলে মানস তুমি
কুমারী বয়সে–
পূজাদিতে শ্রী বুদ্ধ চরণে–।
উত্তম কামনা তোমার।
ভগবান শ্রী বুদ্ধ মন্দিরে
বাসন্তী পূর্ণিমা দিনে
মানস পূজিতে তব আশা আমি
করিব পূরণ।
মোদের নূতন যাত্রা পথে–
হবে জয়–উত্তম মঙ্গল।
তারপর সমাজের প্রথামতে–
নবদম্পতির মঙ্গল কামনা
করিব–চুমুলাঙ–সেই শুভ
মঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
অন্তঃপুরে চল।
(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থানঃ চম্পক নগর রাজ প্রসাদ
(বিজয়গিরি ও সমরগিরির প্রবেশ)
বিজয়গিরি ঃ ভাই– সমরগিরি!
শুন তুমি আমর বচন।
দুই ভাই–লালিত বর্দ্ধিত–
এই চম্পক নগরে।
বীর ক্ষত্রিয় বংশে–
নিয়েছি জনম আমরা।
শিখেছি সমর কৌশল।
বহিঃশত্রু এসে যদি–
কোন দিন এই রাজ্য–
করে আক্রমণ,
দিয়ে মোরা উপযুক্ত সাজা,
মাতৃভূমি করিব রক্ষণ।
সমরগিরি ঃ দাদা! নাহি কোন–
চিন্তার কারণ।
মাতৃভূমি করিতে রক্ষণ,
বাহু শক্তি দিয়ে করি প্রাণ পণ,
সচেষ্ট থাকিব আমরা।
বিজয়গিরিঃ শুন ভাই সমরগিরি!
কল্পনা আমার।

Scanned with CamScanner

বহুদিন আমি করেছি চিন্তন,
তব কাছে করিব প্রকাশ।
দুই ভাই আমরা যখন–
তুমি রাজ্য করিবে রক্ষণ–
দিগ্বিজয়ে আমি–
হইব বাহির।
বীর ক্ষত্রিয় বংশে–
জনম আমরা,
বাহু শক্তি দিয়ে পরিচয়–
ক্ষত্রিয় ধর্ম করিব পালন।
সমরগিরি ঃ দাদা! জ্যৈষ্ঠ তুমি,

পিতার অবর্তমানে–
এই সিংহাসন তব অধিকারে।
বসি সিংহাসনে করিবে রক্ষণ–
এই চম্পক নগর।
দিগ্বিজয়ে আমি বাহির হইব।
বিজয়গিরি ঃ ভাই সমরগিরি!
তুমি কনিষ্ঠ আমার।
রক্ষিবারে এই চম্পক নগর,
তোমাকে দিব রাজ্যভার,
পিতার অবর্তমানে–
এই সিংহাসন দিব অধিকার।
সমরগিরি ঃ দাদা! তুমি জ্যৈষ্ঠ ভাই–
থাকিতে কখন–
নাহি প্রয়োজন এই সিংহাসন,
চম্পক নগর দাদা করিবে রক্ষণ।
বিজয়গিরি ঃ ভাই সমরগিরি।
আশৈশব–মাতৃ পিতৃ ক্রোড়ে
লালিত–পালিত–বর্দ্ধিত–
মোরা দুই ভাই।

তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদর।
বহু আদর যত্ন করেছি তোমারে।
তোমার হাতে করিব অর্পন,
চম্পক নগরে করিতে রক্ষণ।
আমার সংকল্প করিতে সাধন
মনের কামনা মম–
করিবে পূরণ।
সমরগিরি ঃ দাদা! তুমি জ্যৈষ্ঠ সহোদর,
আমি কি দিব উত্তর।
বিজয়গিরি ঃ ভাই–সমরগিরি!
অন্য দিন হবে আলাপন,
চল–বিশ্রাম করিব এখন।

(উভয়ে প্রস্থান)
স্থানঃ চম্পক নগর –বুদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গনে
(রাধামোহন ধনপতি প্রবেশ)
রাধামোহন ঃ ঐ দেখ প্রিয়ে!
ভগবান শ্রীবুদ্ধের মন্দির।
আজ বাসন্তী পূর্ণিমা তিথি–
কি সুন্দর –প্রফুল্ল ধরণী।
চারিদিকে বহে–মৃদু সমীরণে–
বসন্ত মলয় পবনে–
বনের কুসুম সুবাস;
সৌরভিতে মত্ত অলিকুল;
গুঞ্জবনে–পুষ্পরেণু আহরণে।
ধুপ–দীপে ফুলে পুষ্পে
শ্রীবুদ্ধ চরণে করিতে পূজন–
করি মোরা পূজা আয়োজন।
ভক্তি শ্রদ্ধা চিত্তে–
করিব প্রার্থনা–মোদের যাত্রাপথে
হবে জয়– উত্তম মঙ্গল।

Scanned with CamScanner

(ধনপতি একটা থালা মধ্যে পূজার উপকরণ–সহ হাতে লইয়া ভগবান বুদ্ধের প্রতি মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তারপর উভয়ে নত জানু হইয়া উচ্চারণ করিলেন)

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামী।
ধর্মং শরণং গচ্ছামী।
সংঘং শরণং গচ্ছামী।

(উভয়ে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)
(গীত কণ্ঠে বিবেক প্রবেশ)

বিবেক ঃ এ–বার সংসার –চলরে–
যাত্রা পথে।
চলতে হবে– বহু দুরে–
থাকবে ধর্ম তোমার সাথে
সংসার সমুদ্রে পড়ে ঝাঁপি।
করতে– হবে– লাফা –লাফি–
সাগর বক্ষে–সাতার কাটি–
রাখবে সাহস বুকের – পাতে।
এবার সংসার চলারী– যাত্রা পথে।

(বিবেক প্রস্থান)

রাধামোহন ঃ কে তুমি মহাপুরুষ!
বলে গেলে হিত বাণী মোরে!
নূতন সংসার যাত্রাপথে–
মোদের এবার যাত্রা হল শুরু।

(উভয় প্রণাম করিয়া)

রাধামোহন ঃ হে ভগবান–করুণা নিধান,
সহায় হও প্রভূ!
মোদের যাত্রা পথে।
সাক্ষী হও–দেব ধর্ম তুমি,
রক্ষা কর সর্বক্ষণ;
সংসার সাগর বক্ষে–
পাড়ি দিব মোরা দুইজন,
ভাসাইয়ে জীবনের ভেলা।
সীমাহীন পারাবারে–
কোথায় চলে যাবো–
বলিতে পারিনা
তুমি প্রভু সহায় সম্বল।

(গীতকণ্ঠে বিবেক প্রবেশ)

বিবেক ঃ মাভৈঃ– মাভৈঃ – মাভৈঃ।
হাঙ্গর, কুম্ভীর, তিমির দৈত্য–
সাগর বক্ষে ঐ।
সমুদ্রে ভাসলে তরী,
ঝড়–তুফান–উঠবে ভারী,
নির্ভয়ে –চালা–বে–তরী
জীবন সাগরে– ঐ।

(বিবেক প্রস্থান)

রাধামোহন ঃ হে মহাভাগ!
তব হিত উপদেশ–
রাখিব স্মরণ আমি–
জীবনের যাত্রাপথে।
চল যায় –প্রিয়ে–
নিজ গৃহে ফিরে।

(উভয়ে প্রস্থান)
(বৃদ্ধ ছলারবাপ প্রবেশ)

ছলারবাপঃ আজ আমাকে যেতে হবে–
নাতিনের বাড়ীতে।
আমি বুড়ো মানুষ বাবা–
চুমুলাঙের ওঝাগিরি–
আর কয়দিন করবো।
নাতিনের শুভ মঙ্গলের কাম–
না করে – পারি কোথায়!
তাদের চুমুলাঙটা একবার–
করে দিতে পারলেই–বাঁচি বাবা।

Scanned with CamScanner

(রাধামোহন ধনপতি সমস্বরে উচ্চারণ করবে)
হে-চুমুলাঙ গৃহ দেবতা-আমাদের-
সাংসারিক জীবন সুখময় হউক।
ধনে জনে পুত্র কন্যায় আমাদের
গৃহ পরিপূর্ণ হউক।
(উভয়ে প্রণাম করিয়া ছলার বাপের প্রতি বলিবে)
দাদু -আশির্বাদ করুন
আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখময় হউক।
ছলারবাপ ঃ হ্যাঁ- আমি আশির্বাদ করছি।
তোমাদের দাম্পত্য জীবন-মঙ্গল,
সুখময় ও মধুর হউক।
তোমরা নিরাময় দীর্ঘ জীবন-
লাভ করে- আমার দিদি মনি-
এ বৎসর লাল টুক্ টুকে্ সুন্দর-
এক বীর সন্তান প্রসব করুক।
তোমাদের যথা ইচ্ছা পূর্ণ হউক।
রাধামোহন ঃ দাদু! আপনার আশির্বাদ-
শিরোধার্য
আচ্ছা দাদু! এখন স্বপ্নের
ফলাফল কেমন দেখলেন
বলে দিন।
ছলারবাপ ঃ তা-হলে দাদা আর দিদি
আমার স্বপ্নের বিবরণ
শুন মন দিয়া।
গতরাত্রে তোমাদের চুমুলাঙ এর জন্য
শুভাশুভ ফল স্বপ্নে দর্শন করবার
জন্য আমি দেব ধর্ম -চারি লোকপাল
দেবগণ, স্বাক্ষী রেখে- দেবরাজ ইন্দ্র
কে স্বাক্ষী রেখে- নিশা দেবীকে স্মরণ করলাম।
রাধামোহন ঃ তার পর কি- হলো?
ছলারবাপ ঃ তার পর নিজ বিছানায় শুইয়ে
ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন রজনীর
প্রথম প্রহরে এক স্বপ্ন দর্শন করলাম
আমি চৌদ্দ ডিঙা সেজে নানাবিধ পন্য দ্রব্য
নিয়ে- উজান গাঙে-
পাল খাটিয়ে চলেছি।
অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে- নদীর
ধারে নানা ফল ও পশু পক্ষী-
পরিপূর্ণ একটা খুব বড় ছায়াযুক্ত
বট বৃক্ষতলে বিশ্রাম করতেছি-
এমন সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়।
রাধামোহন ঃ তার পর দাদু! পরে কি হলো?
ছলারবাপ ঃ তারপর আমি আবার
স্বপ্নের জন্য নিশা দেবীকে
স্মরণ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।
তখন স্বপ্নে দেখলাম- পূর্বদিকে-
উঠেছে এক ধূমকেতু নক্ষত্র তারা
হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে চেয়ে দেখি-
পূর্ব গগণে উষার রঙিন আলো।
রাধামোহন ঃ বল দাদু! স্বপ্নের ফল কেমন হবে।
ছলারবাপ ঃ তা-হলে দাদা আর দিদি
কান পেতে শুন!
প্রথম প্রহরের স্বপ্নটার ফল
তোমাদের দাম্পত্য জীবন
উজানে চলবে।
ছলারবাপঃ কিন্তু!
রাধামোহন ঃ কিন্তু মানে দাদু!
ছলারবাপ ঃ কিন্তু! কিছু নয়-তবে-
এখন স্বপ্নে সপ্তডিঙা সাজিয়ে
নানা পন্য জিনিস লয়ে-বড় নদীর
উজান যেতে যেতে-সেই বটবৃক্ষ
ছায়াতলে বিশ্রামে করছিলাম-
তোমার এক সুপুত্র জন্ম নিবে।
বৃদ্ধ বয়সে সেই পুত্রের আশ্রয়ে

Scanned with CamScanner

সুখে–শান্তিতে–জীবন অতিবাহিত করতে পারবে।
আর দ্বিতয়ি স্বপ্ন–পূর্বদিকে–
যেই ধূমকেতু তারা দেখেছিলাম–
এক সময়ে দেশে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে।
রাধামোহনঃ আচ্ছা! দাদু! তাই যদি হয়–
আমাকে কি–যুদ্ধে যেতে হবে নাকি?
ছলারবাপঃ তা– বলা যায়না– দাদু!
দেশে যদি–যুদ্ধের–ডাক এসে যায়
তা–হলে কি আর
নীরব থাকা যায়।
রাধামোহন ঃ আচ্ছা–দাদু! যদি আমি
যুদ্ধে যাই–তা–হলে
জয়ী হতে পারবো কি?
ছলারবাপ ঃ আমি আশির্বাদ করলাম
নিশ্চয় জয়ী হবে।
আমি বুড়ো–মানুষ–দাদু!
অনেক খাওয়া দাওয়া করলাম–
এবার হাসিমুখে করহ বিদায়।
(ধীরে ধীরে ছলারবাপ প্রস্থান পরে
রাধামোহন ও ধনপতি প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান ঃ চম্পক নগর রাজসভা।
(উদয়গিরি ও কালাবাঘার প্রবেশ)
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রীবর!
ইচ্ছা হয় মম–
বসাইয়ে রাজ সিংহাসনে,
জ্যৈষ্ঠ পুত্রে দিব রাজ্যভার।
কিন্তু! কি করিব – বল!
আমার জীবন প্রদীপ,
যত দিন নাহি হয় অবসান–
পুত্র বিজয়গিরি –চহেনা–
বসিবারে রাজ সিংহাসনে।
কালাবাঘা ঃ মহারাজ! হলো উপস্থিত–
যৌবনের প্রথম বসন্তে–
কুমার এখন।
ক্ষত্রিয় বীর সন্তান,
নব তেজ বল, শোনিত প্রবাহ
শিরায় –শিরায়, বাহু ধমণীতে,
সঞ্চারিত নব উদ্দীপনা।
উৎসাহ–উদ্যম তাহার–
জাগে প্রাণে নূতন প্রেরণা।
(দূত প্রবেশ)
(রাজাকে কুর্ণিশ করিয়া প্রণাম করিল)
উদয়গিরি ঃ বল দূত! কি সংবাদ।
দূত ঃ মহারাজ? উদয়পুরের রাজদূত
মহারাজের দ্বারে সাক্ষাৎ প্রার্থী।
উদয়গিরি ঃ যাও–দূত! উদয়পুরের
রাজদূতকে– রাজসভায় নিয়ে এস।
(দূত প্রস্থান)
(উদয় পুরের রাজদূত সহ পুনঃদূত প্রবেশ)
(উদয় পুর রাজদূত– কুর্নিশ করিয়া রাজাকে প্রণাম দিল)
উদয়পুর রাজদূত ঃ মহারাজের জয় হোক।
উদয়গিরি ঃ বল দূত! কিবা প্রয়োজনে–
কোথা হতে আগমন তব।
উদয়পুর রাজদূতঃ মহারাজ! আমি উদয়পুর রাজদূত। মহারাজের নিকট
রাজা একখানা পত্র পাঠিয়েছেন
(পত্রখানা রাজার হাতে অর্পন করিলেন)
(উদয়গিরি পত্র লইয়া আবার মন্ত্রীর হাতে দিলেন)
উদয়গিরিঃ মন্ত্রী মহাশয়!
পড়ে দেখুন (পত্র খানা)

Scanned with CamScanner

উদয় পূর্বের রাজা– পত্রের মাঝে
কি বা লিখিয়েছে।
কালাবাঘাঃ (পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন)
মহামান্য,
চম্পকনগরের মহারাজ সমীপেষু
যথাবিহিত সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই
পূর্বদিকে জংলী কুকী রাজা কালঞ্জয়;
দক্ষিণ দিকে রোয়াঙ্গের মঙ্গল রাজা
আর সমুদ্র কুলের জল দস্যুরা উদয়পুরে
এসে প্রকাশ্য দিবালোকে–লুণ্ঠন
নর হত্যা ও নারী নির্যাতন করে যাচ্ছে।
তাদের অত্যাচারে উদয়পুর রাজ্য–
বাসীগণ, আজ গৃহ হারা–পথে
প্রান্তরে–পাহাড়ে–জঙ্গলে–পর্বত
গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।
সেই দস্যু তস্করের ভয়ে– বহুগ্রাম।
জনপদ–জন শূণ্য অরণ্যে পরিণত।
স্বয়ং আমাকে পর্বতের গোপন দূর্গে–
আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।
এই দু:সময়ে– মহারাজের আশ্রয় ও
সাহায্য প্রাথ্যনা করছি।

ইতি
বিনয়া বনত নিবেদক
উদয়পুর রাজ

উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রীবর!
বড় জটিল সমস্যা এখন।
উদয়পুর রাজ দস্যু কবলিত।
চাহিয়াছে–মম কাছে–
আশ্রয় ও সাহায্য কামনা।
বল মন্ত্রী কি দিব উত্তর।
কালাবাঘাঃ মহারাজ! কহে জ্ঞানীগণ,
শাস্ত্রের বচন।
– ভয়াত্তকে অভয় দান,
তৃষ্ণাতুরকে জল দান,
নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান,
এই হলো মানবতার পরিচয়।
উদয়গিরি ঃ সত্য বটে। মন্ত্রী মহাশয়!
শুধু–নহে মানবতা–
নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান
রাজ ধর্ম বটে।
কিন্তু! আমি আজ–
উপনীত বার্দ্ধক্য দশায়,
হয়েছে শিথিল মম–
বাহু শক্তি বল,
নাহি আর যৌবনের–
সেই রণ উন্মাদনা।
নহিলে অতি তুচ্ছ–
বিতাড়িত সেই দস্যুদল,
উদয়পুর রাজ্য হতে।
এসময়ে রাজ্য হতে।
এ সময়ে আমি–
কি করিতে পারি বল।
কালাবাঘা ঃ মহারাজ! চিন্তা নাহি আর–
ইচ্ছে যদি হয়,
নিরাশ্রয়কে দিবার আশ্রয়,
অসহায়ের করিতে সহায়।
অতি শীঘ্র লয়ে সৈন্যগণ,
যুবরাজে করুন প্রেরণ।
বিতাড়িয়ে–দস্যু হানাদার
উদয়পুরে করে দাও–
পুন:বার শান্তির স্থাপন।
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রী মহাশয়!
আশ্রয় ভিক্ষা চাহিয়েছে যদি–
উদয়পুর রাজা,

Scanned with CamScanner

কেমনে করিব তাহা–
অবহেলা আমি।
এখন কর্তব্য আমার –
রক্ষিবারে– বিপন্ন রাজাকে–
দস্যুর কবল হতে।
কালাবাঘাঃ মহারাজ! রাজধর্ম কর্তব্য পালন, শত্রু বিতাড়ন, বিপন্নকে রক্ষা করা নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান–
অসহায়ের সহায় সম্বল।
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রীবর!
সেই দস্যু কবলিত–
বিপন্ন রাজাকে করিতে উদ্ধার,
সত্ত্বর পাঠাইব–সসৈন্যে–
মম জ্যৈষ্ঠপুত্র বিজয়গিরিকে।
কালাবাঘাঃ মহারাজ! উত্তম সংকল্প!
যুবরাজ বিজয়গিরি
সমরে নিপুন,
লয়ে সৈন্যগণ–
তাঁহাকে করিলে প্রেরণ–
অতিশ্রীঘ্র বিতাড়িয়ে দস্যুদল,
উদয়পুর শত্রু মুক্ত করিবে সত্বর।
অবহেলে করিবে দমন,
অত্যাচারী –লণ্ঠনকারী–
পাহাড়ীয়া কুকী রাজা– কালঞ্জর,
রোয়াঙের দস্যু মঙ্গল রাজাকে।
উদয়গিরি ঃ মন্ত্রীবর! করিলাম স্থির–
মন্ত্রনা তোমার।
এখন যাও দূত!
ফিরে উদয়পুর।
বল গিয়ে সুসংবাদ–
উদয়পুর রাজাকে।
অতি শীঘ্র পাঠিয়ে দেব–
বিপুল বাহিনী সেন–
সঙ্গে যুবরাজ,
শত্রু মুক্ত করিবারে–
উদয়পুর রাজ্য।
উদয়পুরের রাজদূতঃ যথা আজ্ঞা মহারাজ!
(দূত–রাজাকে কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান)
উদয়গিরি ঃ মন্ত্রীবর।
দস্যু কবলিত বিপন্নকে করিতে–
উদ্ধার–যথা শক্তি দিয়ে আমি–
সাহায্য করিব।
চাহিয়াছে– সাহায্য আমার–
উদয়পুর রাজা।
রাজধর্ম মতে কর্তব্য পালন–
সময় এখন।
কালাবাঘাঃ মহারাজ! ধন্য এ জগতে–
রাজধর্ম মতে যদি করেন
কর্তব্য পালন।
উদয়গিরি ঃ শুন মন্ত্রীবর। শীঘ্রই
করহ আহ্বান পাত্র মিত্র–
অমাত্য সকল। যুবরাজ–
বিজয়গিরি আর সমর গিরি,
রাজসভা মাঝে। চল বিশ্রাম করিতে।
(উভয়ে প্রস্থান)

* বিজয়গিরি শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার একটি অপ্রকাশিত নাটক। এটি চার অঙ্কের ২১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত একটি ছোট খাতায়। এই পর্বে প্রথম অঙ্ক ছাপা হলো। পরবর্তী গুলো ধারাবহিকভাবে প্রকাশিত হবে। তবে নাটকটির লিখিত সন বা তারিখ উল্লেখ নেই। এটি সম্পাদক পাণ্ডুলিপি হিসেবে উদ্ধার করেন ১২ই জুন,২০০৮ সনে তার পুত্র দিলিপ তঞ্চঙ্গ্যা থেকে। এর আগে প্রকাশিত (৪র্থ সংখ্যা) 'রাধামন ধনপতি কাব্য'ও সম্পাদক কর্তৃক উদ্ধারকৃত একই তারিখে। কার্ত্তিকচন্দ্র কবি ও ডাক্তার হিসেবে সর্বাদিক পরিচিত। তিনি ১৯২০ সালে জন্ম গ্রহণ এবং ১৯৯৭ সালের ২২শে মার্চ পরলোক গমন করেন।

Scanned with CamScanner

পরীকন্যা মানোহারী

(তঞ্চঙ্গ্যা রূপকথা)

কথক: অর্জুন কারবারী (মুভাছড়ি)

সংগ্রহে: সপ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক রাজার সাত পুত্র ছিল। সবার ছোট হচ্ছে কালজয়। বড় ভাই ছয় জনের বিবাহ হয়ে যায়। কালজয় বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে যৌবন প্রাপ্ত হলে তাকেও বিয়ের ব্যবস্থার কথা বলা হলে সে রাজী হয় না। সে সর্বদা একাকী দীঘির পাড়ে অথবা গাছ তলায় বসে কি যেন চিন্তায় থাকে। মানুষ জন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে তেমন কোন মেলা মেশাও নাই। তাই সব ভাই ও ভাবীরা তার প্রতি রুষ্ট। এ অবস্থায় একদিন সে তার কাপড় চোপড় ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে রাজবাড়ি ত্যাগ করে।

পথে যেতে যেতে এক গহীন অরণ্যে পৌঁছে। সেখানে এক মুনির সাথে তার দেখা হয়। সে মুনিকে দেখে শ্রদ্ধাচিত্তে প্রণাম করে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করে। মুনি তাকে আশ্রয় দেন। মুনির একটি বন্দুক ছিল। একদিন রাজপুত্র কালজয় সেই বন্দুক নিয়ে শিকারে যাবার অনুমতি চেয়ে নেয়। মুনি কালজয়কে উপদেশ দিলেন, "কুমার তিনদিক ঘুরবে কিন্তু একদিকে যাবেনা।"

একদিন গভীর রাতে কুমার কালজয় চিন্তা করে,"বন্দুক যখন আছে আর কিসের ভয়? না, সব দিকেই ঘুরে দেখব; দেখি কি হয় ?" পরদিন খুব ভোরে খেয়ে দেয়ে বন্দুক নিয়ে সে বনে শিকারে বের হয়। সে তিন দিক ঘুরে এসে চতুর্থ দিকে যেতে যেতে এক গভীর বনে পৌঁছে। সামনে দেখে বনের ভিতরে এক বড় পুকুর। সে পুকুর পাড়ে একটি বড় গাছের নীচে বসে বিশ্রাম নিতে থাকে। এমন সময় সে চারিদিকে শোঁ শোঁ শব্দ শুনেতে পেল। এরপর দেখল সাত জন পরীকন্যা তাদের সকলের কাপড়-চোপড় এক জায়গায় রেখে পুকুরে স্নান করতে নামল। পুকুরে তারা মন প্রাণ খুলে হাসি কল কোলাহলে জলক্রিড়া করতে থাকে। কুমার দেখে একজনের চেয়ে আরেকজন দারুণ সুন্দরী !

কুমার কালজয় ভাবল, তাদের বেশ, চেহারা যতই দেখা যায় ততই দেখার সাধ জাগে। তার মনে দুষ্টু বুদ্ধির উদয় হল। সে চুপি চুপি পরীদের সব কাপড়-চোপড় তুলে নিয়ে একটি বড় গাছের সুরঙ্গের ভিতর ঢুকিয়ে রাখল। পরীরা বিন্দু মাত্রও জানল না। কুমার কালজয় মন প্রাণ ভরে পরীদের রূপ আর খেলা দেখতে থাকে।

পরীরা অবশেষে খেলা স্নান ছেড়ে পুকুর পাড়ে এসে দেখে যে তাদের কারোর কোন কাপড় চোপড় নেই। অবশেষে পাশে খুঁজে দেখে কাপড় না পেয়ে তারা অভিশাপ দেয় যে, "যে আমাদের কাপড় চোপড় নিয়ে গেছে সে যাতে কাল কুকুর হয়ে আমাদের কাপড়-চোপড় এনে দেয়।" অতঃপর কুমার কালজয় তাৎক্ষণিকভাবে একটি কাল কুকুরে পরিণত হল এবং পরীদের সব কাপড়-চোপড় নিজে রাখা স্থান থেকে কামড়িয়ে নিয়ে এসে ফেরত দিল। পরীরা কাপড় পড়ে শোঁ

Scanned with CamScanner

শোঁ শব্দে আকাশে উড়ে গেল। কুমার কালজয় কাল কুকুর হয়ে পরীদের যাবার পথে হা করে চেয়ে রইল।

পরে কাল কুকুর হয়ে মুনির কাছে ফিরে আসলে মুনি ব্যাপার খানা বুঝতে পারলেন। মুনি মন্ত্র পাঠ করে কুমার কালজয়কে আবার মানুষে পরিণত করেন।

এদিকে কুমার কালজয়ের কিন্তু পরীদের সর্ব কনিষ্ঠা বোন মানোহারীকে খুব বেশী পছন্দ হয়েছে। সে তাকে আপন করে পেতে চায়। একদিন মুনির কাছে সে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করে মানোহারীকে পাবার শক্তি ও উপায় যাতে সে পায়। অতঃপর মুনি তার প্রার্থনা পূরণ করেন। তিনি তাকে একটি লাঠি ও একটি টুপি দান করে আশীর্বাদ করেন যে,"এই লঠি ঘুরালে তোমার পছন্দ মত খাওয়া দাওয়া হাজির হবে। আর এই টুপি মাথায় দিয়ে তুমি যাকে প্রয়োজন মনে করবে তাকে কাছে পাবে।"

মুনির আশীর্বাদ পেয়ে কুমার কালজয় একদিন খুব সকালে মুনি কাছ থেকে বিদায় নিল। বনের ভিতরে সে আবার ঐ পুকুর পাড়ে গিয়ে বসল। ঠিক দুপুর বেলা পরীরা আসল। পূর্বের মত তাদের কাপড়-চোপড় পাড়ে রেখে পানিতে নামল। কুমার কালজয় ভাবল, "এবার তাদের খেলা দেখা যাবে।" পরীরা কেউ শামুক, কেউ কাঁকড়া আর কেউ চিংড়ি মাছ হয়ে স্নান আর খেলা খেলতে থাকে। ইতি মধ্যে তাদের অগোচরে কুমার কালজয় আবার তাদের কাপড় চোপড় লুকিয়ে রেখে দেয়।

পরীদের স্নান আর খেলা শেষ হল। পুকুর পাড়ে উঠে এসে দেখল তাদের কাপড় চোপড় আবার হারিয়ে গেছে। এবার বড় বোনেরা ঘোষণা করল, "যিনি আমাদের কাপড়-চোপড় লুকিয়ে রেখেছেন-দ্রুত এনে দিন। যিনিই আমাদের কাপড়-চোপড় এনে দিবেন তাঁকে আমরা আমাদের ছোট বোনকে উপহার দেব।"

পরীদের ঘোষণায় খুশী হয়ে কুমার কালজয় তাদের সকলের কাপড়-চোপড় এনে দেয়। দেখে যে, পরীরা সবাই নিম্নাংগে হাত দিয়ে লজ্জায় জড়ো হয়ে উদোল গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরীরা কাপড়- চোপড় পেয়ে পরিপাটি করে পরিধান করল। তাদের বিমানে উঠে রওনা দেবার প্রস্তুতি নিল। কুমার কালজয়ও তাদের সাথে যেতে চায়। ছোট বোন মানোহারীর অনুরোধে কুমারকেও বিমানে তোলা হল। কিন্তু মনুষ্য শরীর এত যে ভারী! বিমান আর উড়তে পারছে না। বড় মুশকিলে পড়লো তারা। কেউ কেউ বললো, ভর কমানোর জন্য বিমানের এক অংশ কেটে ফেলা হোক। না, তা হয়না। খুব কষ্ট করে ধীরে ধীরে তারা পরী রাজ্যে পৌঁছে গেল।

বড় বোনেরা সকলে পরীমহলে চলে গেল। ছোট বোন মানোহারী মানব স্বামীকে কিছু মন্ত্রণা দেবার উদ্দেশ্যে পিছনে থেকে গেল।

মানো কুমারকে বুঝিয়ে বলল যে, "আমি প্রাসাদে গিয়ে আমার গায়ের ময়লা দিয়ে একটি মাছি বানিয়ে তোমার কাছে আমার চিঠিসহ পাঠাব। চিঠি পাবার পর সেই মাছির সাথেই তুমি পরী প্রাসাদে চলে আসবে। ও! হে! সাবধান; পথে কিন্তু অনেক ডাইনী, পেত্নী তোমাকে ধরে রাখতে

Scanned with CamScanner

চেষ্টা করবে। তাদের সকলকে পরাজিত করে মাছির সাথে তোমাকে এগিয়ে আসতে হবে। তোমাকে একটি আংটি দিচ্ছি এই নাও। এ- আংটিটা পড়লে আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে দেখবে না"- অত:পর মানো পরীমহলে চলে যায়।

কুমার কালজয় মানোর চিঠির অপেক্ষায় থাকে। মনে ভয় ভয়ও লাগে। কি জানি কি হয়। অবশেষে মাছি পৌঁছল। কুমার দেখল; চিঠি সহ এক বিরাট নীল মাছি ভন্ ভন্ শব্দ করে তার দিকে উড়ে আসছে। কুমার তার হাত তুলে মাছিকে ইশারা দেয়। মাছি কাছে আসলে চিঠি খানা নিয়ে পড়তে থাকে। মাছি তার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে। চিঠি পড়া শেষ করার পর আবার ইংগিত দিলে মাছিটা আস্তে আস্তে উড়ে পথ চলতে শুরু করে। কুমারও পিছু পিছু রওনা দেয়। পথে দেখা গেল কতো ডাইনী, পেত্নী সুন্দরী মানবী রূপ ধরে উলঙ্গ শরীরে পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
কুমারকে লক্ষ্য করে তারা প্রত্যেকেই বলছে-
"হাঁও মাঁও, মানব পুত্রের গন্ধ পাঁও,
কাছে এসো সংগ দাও।"
কুমার অবস্থা বেগতিক দেখে ভদ্রতা-নম্রতা ত্যাগ করে বলে উঠল-
"ডাইনী, পেত্নী উদিয
মানো পথটান্ ছাড়িয।"
অর্থাৎ- "ডাইনী, পেত্নী হঠে যাও মানোর পথটি ছেড়ে দাও"।
আর সাথে সাথে কাউকে কিল-ঘুষি আর কাউকে লাথি মেরে একে একে সকলকে ডানে বামে ফেলে দিয়ে মাছির পিছু পিছু এগিয়ে গেল। ঠিকই মানোর কাছে পৌঁছল। মানো তাকে সাদরে বরণ করে নিজ কক্ষে নিয়ে যায়। কুমার দেখে কী অপরূপ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ পরিমহল আর কী মনোহর রূপ পরীকন্যা মানোহারীর! যা দেখে একজন মানবের পক্ষে সবকিছুই ভুলে যাওয়া অতি সহজ ব্যাপার। মানোর দেয়া আংটিটার গুণ প্রভাবে কুমার-মানো কথা বলছে। কুমার সবাইকে এবং সব কিছুই দেখছে কিন্তু কুমারের শব্দ শুনলেও মানো ব্যতীত আর কেউ কুমারকে দেখতে পাচ্ছেনা। কী দারুণ মজার তামাসা!
দু'একদিন পর ভেবে চিন্তে মানো তার বাবার কছে মানব পুত্র কুমার কালজয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব রাখে। পরীরাজ জামাইকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জামাইকে দেখে আপাতত: মনপুত হলে তিনি আরও কঠিন কঠিন বেশ কয়েকটি পরীক্ষা করবেন। এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তবে বিয়ে হতে পারে বলে দিলেন ছোট মেয়ে মানোকে। পরীরাজ জামাই দেখলেন। ঠিক হলো আগামী কাল সকাল থেকে পরীক্ষা শুরু হবে।

প্রথম পরীক্ষাঃ- সাত বোনের সাত খাদি (ওড়না) থেকে নিজের স্ত্রী (মানো) র খাদি বেছে নিতে হবে।
কুমার এ ঘোষণায় চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে মাথায় টুপি আর হাতে আংটি পড়ে মানোর কাছে ব্যাপার খানা খুলে বলল।

মানো বলে, "ওটা কী আর তেমন ব্যাপার হল? আমার খাদিতে আমি পিসি (পুঁথি) গেঁথে রাখবো। তোমার চিনতে কোন অসুবিধা হবেনা।" কুমার স্বস্থি পেল এবং পরীক্ষায় পাশ করল।

দ্বিতীয় পরীক্ষাঃ- সাত বোনের সাত আংগুল থেকে মানোর আংগুল ধরতে হবে। সকলকে কাপড় ঢেকে রাখা হবে।

মানোর পরামর্শ মতো কুমার একটু উচুঁকরা আংগুল ধরে এবং এবারও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তৃতীয় পরীক্ষা ঃ- একটি গাছে ৭টি ফলের ভিতর পরীরা ঘুমাবে। বান (তীর) মেরে মানোর ফলটি ফেলতে হবে।

এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই মানোকে মানব পুত্র কালজয়ের সাথে বিয়ে দেয়া হবে। না হয় মানব পুত্রের মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে।

পরীরাজের একথা ঘোষণার পর কুমারের মহাচিন্তা! তার হয় আশা পূরণ না হয় মরণ। কুমার আবার মাথায় টুপি আর হাতে আংটি পরে মানোর পরামর্শ চাইতে যায়। কথা শুনে মানো হেসে হেসে একটা শ্লোক আবৃত্তি করে,-

"মন দআর থালেই খোলা
বাঁধা তাধা কিচ্ছু নয়
বান রয়ে (শব্দে) পুরিন ঝুরি
তুই মর মুই তর!!"

অর্থাৎ- মনের দরজা খোলা থাকলে কোন বাঁধাই কাজ হয় না। মানো যখন মানব পুত্রে মন দিয়েছে বান বা তীর যেদিকেই যাক শব্দের সাথে সাথে ঝরে পড়বে। ফলে কুমার মানোর মিলন হবে।

যথাসময়ে পরীক্ষা হলো। কুমারের তীরের শব্দে মানোর ফল গাছ থেকে ঠিকই ঝরে পড়লো। রাজা ভাবেন, নিজের মেয়েরই কর্ম। অত:পর মহা উৎসবের মধ্যদিয়ে মেয়ে মানোহারীর সাথে মানবপুত্র কুমার কালজয়ের বিয়ে দেন।

বিবাহের পর তিনবছর চলে যায়। কাল-মানোর সংসার জীবন সুখে শান্তিতে আমোদ প্রমোদে চলতে থাকে। এমন সময় কালকে একদিন নীরবে কাঁদতে দেখে মানো কারণ জানতে চায়। কাল প্রথমে লুকাতে চায়। কিন্তু স্ত্রীর বার বার অনুরোধে সে আর গোপন রাখতে পারল না। স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলল যে পরী আর মানবের মন মানসীকতা তো আলাদা তোমাদের পরীপ্রসাদে যতই সুখে থাকিনা স্বীয় মা-বাবা-ভাই-ভাবী আর আত্মীয় স্বজনের কথা এবং স্বীয়রাজ্যের কথা তো ভুলা যায় না। মনে পড়লে খুবই দুঃখ লাগে।

কুমার কালজয়ের (স্বামী) কথা শুনে মানোরও মন গলে গেল। সে বলল, "স্বামী তোমাকে মনে প্রাণে চেয়েছি বলেই বিয়ে করেছি। এর পর তোমার যেখানে খুশী সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে পার। সংগে আমি যাবোই। স্বামীর মানসিক অবস্থার কথা মানো তার বাবাকে বুঝিয়ে বলে।

বাবাকে এ কথা বলার আগে সে সোনা ও রূপার খই দিয়ে প্রণাম করে।

Scanned with CamScanner

বাবা পরীরাজ মানোর সব কথা জেনে শুনে মেয়ে মানোকে বললেন, "আকাশ পথে গেলে বিমান, সমুদ্র পথে গেলে জাহাজ আর স্থল পথে গেলে হাতী ঘোড়া দেব। কোন পথে যেতে চাও?" মানো চাইল বিমানে করে যেতে। তার বাবার কাছে একান্ত আবদারের সুরে বলল "বাবা, তোমার জামাই তোমার সোনা মমং আংগি যাত্ছয়া চান্তে।" অর্থাৎ সোনার আংটিটা চাচ্ছে। যে আংটির প্রভাবে দুনিয়ার যাই চাওয়া হয় তা-ই পাওয়া যায়। বাবা রাজী হলেন, এবং আংটি পড়া হাতটি ঝাঁকি দেয়ার সাথে সাথেই আংটিটি জামাইয়ের আংগুলে ঢুকে গেল।

তারপর মেয়ে জামাইয়ের মানব কুলে ফেরত যাত্রার জন্য সুন্দর করে একটি বিমান সাজিয়ে দেয়া হল। বিমানে টাকা, পয়সা, সোনা, রূপা, মুনি-মুক্তা, খাবার, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দিয়ে পূর্ণ করে দেয়া হল। কুমার কালজয় ও মানো শ্বশুর শ্বাশুরী ও মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানে উঠে বসল। যথা সময়ে বিমানটি রওনা দিল। বিমানটি উড়তে থাকে।

মাঝপথে এক রাজ্যের এক ডাকাত সরদার লোহার জাল দিয়ে বিমানটি আটক করে এবং ভূ-পাতিত করে। বিমান ভর্তি অগাধ সম্পত্তি আর পরমা সুন্দরী স্ত্রী মানো সবই ডাকাতের হাতে চলে যায়। কুমার ডাকাতদের সাথে প্রাণপন যুদ্ধ করে পরাজয় বরণ করে। ডাকাত সরদার তাকে ঘোড়ার ঘাস কাটার দায়িত্ব দেয়। সরদার মানোকে বিয়ে করতে চায়। ডাকাতের বিয়ের প্রস্তাবে মানো প্রথমে রাজী না হলেও নির্যাতনের ভয়ে পরে বুদ্ধিকরে ছয় মাস পরে বিয়ে করার কথা দেয়, সর্দার মানোকে বন্ধীশালায় আটকে রাখে ।

দিন চলে যায়। কুমারকে কাজের তুলনায় খেতে দেয়া হয় অনেক কম । শরীর তার জীর্নশীর্ন ও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ঘাস কাটার পর সেই ঘাসের বোঝা ঘোড়াশালে বহন করে আনার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে। ঘাস কাটতে গিয়ে কেবল কেঁদে কেঁদে দিন কাটায়। এ সময় স্বয়ং ভগবান ব্রাহ্মণের রূপ ধরে কুমার কালজয়ের সামনে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ কুমারকে আর্শীবাদ দিয়ে দু'টি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে যান।

মন্ত্র -১। "লাদ পরীক্ষা"-এই মন্ত্র যে বা যার উদ্দেশ্যে বলা হবে তা লেগে যাবে, আর সরবেনা।

মন্ত্র-২। "চুধ পরীক্ষা "-এই মন্ত্রে যা লেগে আছে তা সরে যাবে। কুমার ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পুষ্ঠ এ দু'টি মন্ত্র ঘাসের বোঝা বহনের কাজে ব্যবহার ও বার বার পরীক্ষা করে। এভাবে দেখতে দেখতে ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল । আগামীকাল সর্দার বড় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানোকে বিয়ে করবে। ডাকাত সরদার বিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষকে নিমন্ত্রন করে। লোকজন এসে সভা কক্ষে যার যার আসনে বসে পরে । মানোকে বিবাহ বস্ত্রে সাজিয়ে মঞ্চে হাজির করানো হয়। অল্প কিছুক্ষণ পরেই বিবাহ মন্ত্র পাঠ করা হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে কুমার "লাদ পরীক্ষা " কথাটি উচ্চারণ করে। এতে উপস্থিত সকলেই যে যেই আসনে বসে আছে সে সেই আসনের সাথে লেগে গেছে বড়ই বিপদ দেখে ডাকাত সরদার এক বড় গনক ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠায়। ব্রাহ্মণের সাথে আগত বুড়ি ব্রাহ্মণকে ও দেখা গেল-সেও ব্রাহ্মণের পিঠে লেগে আছে। পিঠ থেকে নামানো যাচ্ছেনা।

Scanned with CamScanner

অত:পর এ অবস্থায় বুড়িকে পিঠে নিয়ে ব্রাহ্মণ ঘটনার ব্যাপার স্যাপার গণনা করলেন। বহুক্ষণ ধরে এটা ওটা সবকিছু গণনা করে ডাকাত সরদারকে বললেন," তুমি উড়ন্ত একটি বিমান আটকিয়ে বিমানের সম্পদ লুট করেছ। বিমানের আরোহী নব দম্পতির মধ্যে স্বামীকে ঘোড়ার ঘাস কাটতে দিয়ে অসহনীয় যন্ত্রনা দিচ্ছ আর তার স্ত্রীকে আজ তুমি বিবাহ করতে যাচ্ছ। এহেন লোভ লালসার ফলে এখন তোমার এ অবস্থা। সুতরাং এ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে যে পরিমাণ সম্পদ তুমি বিমান থেকে নিয়েছ তার তিনগুন দিয়ে পূরণ করে স্বামী স্ত্রী দু'জনকে বিদায় করে দেয়া আর না হয় মুক্তি নাই।"

অত:পর ব্রাহ্মণের কথা মত মুক্তির আশায় ডাকাত সরদার সবকিছুর ব্যবস্থা করলো। কুমার কালজয় আর তাঁর স্ত্রী মানোহারীর কাছে শতবার ক্ষমা চাইল। কুমার ও স্ত্রী মানো বিমানে উঠে বসলো। বিমানের উড়ে যাবার মুহুর্তে কুমার উচ্চারণ করলেন "চুধ পরীক্ষা"। তখন লেগে যাওয়া সকলে মুক্তি পেল।

কুমার কালজয় স্ত্রী পরীকন্যা মানোহারীকে নিয়ে পিতৃ রাজ্যে পৌঁছে। রাজ বাড়িতে পৌঁছলে খুশীতে মহা ধুমধামে সাত দিন সাত রাত ধরে আনন্দ উৎসব আয়োজন করা হয়।

কিছুদিন পর পরীকন্যা মানো বিড়ালের রূপ ধারণ করে। ইহা সকলের জানাজানি হয়ে যায়। সকলেই রাজাকে আপত্তির সুরে বলে যে, মহারাজের কনিষ্ঠা পুত্রবধু বিড়ালের বংশ। তার কাছে কাজকর্ম, রূপ, বস্ত্র কিছুই পাওয়া যাবেনা। পরীক্ষা করলেই ধরা পড়বে।

প্রথম পরীক্ষা ঃ অত:পর রাজা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে হুকুম দিলেন; আগামী কাল তিনি সাত পুত্রবধুর হাতের রান্না খাবেন। যে পুত্রবধু এতে অসমর্থ হবে বা নিম্নমানের খাবার তৈরী করবে সেই পুত্রবধুসহ পুত্রকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে।

কুমার কালজয় স্ত্রীকে পিতার আদেশের কথা শুনিয়ে দেয় ও মহা চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু মানো আনন্দিত হয়ে বলে, "তা তো অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা।" মানো রাতের মধ্যেই পরীর খাবার তৈরী করে রাখেন। পরদিন রাজা পরীর খাবার খেয়ে ছোট বউয়ের সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতুহলী হন। কারণ ছোট বউয়ের রান্নাই তার বেশী / অপূর্ব স্বাদ লেগেছে। ইহার পর সব পুত্রবধুদের আরও অন্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন।

দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ রাজা হুকুম দিলেন সব পুত্রবধুদের সাজগোজের বস্ত্রাদি দেখবেন। মানো এ পরীক্ষায় শ্বশুর বাবাকে বিমোহিত করেন।

তৃতীয় পরীক্ষা ঃ সব পুত্রবধুকে রাজা স্বচক্ষে দেখবেন।

মহারাজ একে একে একে সব পুত্রবধুকে দেখে নেন। সর্বশেষে সর্বকনিষ্ঠা পুত্রবধু মানোহারী ধীরে ধীরে মহারাজের সামনে উপস্থিত হলে তার রূপ লাবণ্যে রাজপুরী ঝলমলিয়ে উঠল। তার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মহারাজ ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

এ পরীক্ষার পর মহারাজ অত্যন্ত খুশী হলেন; সকলকে আশীর্বাদ করলেন। সকলেই যাতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে অত্যাধিক খুশি হয়ে কনিষ্ঠ পুত্র কুমার কালজয়কে বিয়া রাজা (Acting রাজা) উপাধিতে ভূষিত করলেন।

-মে / ২০০১ ইংরেজী

Scanned with CamScanner

আদামর ফুল (তিন)

বি,এন, তনচংগ্যা

ঢালু পাহাড়ের বুকে সোনালী চাদর বিছানোর মতো পাকা ধান। যে দিকে তাকায় চোখ জুড়িয়ে যায়,পাকা সোনালী ধান আর ধান। চান্দোবিদের জুম। জুমের মধ্যখানে টং ঘর। মনে হয় যেন দক্ষ চিত্রকর শিল্পী জল রং দিয়ে ছবি একেছেন। জুমে পাকা ধানের মধ্য দিয়ে পথ। পথের দু'ধারে নানান রঙের গাদা আর চুমা ফুল। মনে হয় যেন প্রিয়তমকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে এই ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দৃশ্যতঃ চান্দোবিদের মোইন ঘরটা যেন কোন ল্যাঙা-লাঙানীদের কল্পনার আবাসস্থল। জুমের চারিধারে উচুঁ উচুঁ বড় বড় কড়ইগাছ, সবুজ শ্যামল গাছ গাছালিতে অপরুপ দৃশ্য। এই সময়ে জুমের পাকা ধানে সোনালী রঙ ধরেছে। জুম্মোদের মনেও আনন্দের রঙ ধরেছে।

ভাদ্রের দুপুরে রোদ্রের প্রখরতা খুব বেশী। এই রোদ্রের প্রখরতা আর ধান খেকো টিয়ার যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলছে কান্দারাকে। কান্দারা কান্তা হাতে গুলতি ছুড়তে ছুড়তে সারা জুমময় বেড়াতে বেড়াতে চান্দোবিদের মোইন ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে চান্দোবিদের টং ঘরের মধ্যে কন্যা, পাইনো, গন্ধরী ও দু জন মিলে হৈ হল্লোর করছে। তাদেরকে দেখে কান্দারা ঈশারায় একটা ডাক দেয় উ-হু-হু করে। কান্দারার ঈশারার ডাক শুনে চান্দোরা চিৎকার দেয় "আঃ- হিঃ; আঃ- হিঃ"। চান্দোরা নানান রঙে ডঙের গল্প গুজবে মশগুল। সাড়া পেয়ে কান্দারা চান্দোদের মোইন ঘরে আসতে থাকে। টং ঘরের সিড়ি গোড়ায় এসে কান্দারা বলে "বইন লক্ কি গরত্ত্বে"। এই বলে টং ঘরের কাঠ দিয়ে বানানো সিড়ি দিয়ে উঠে উচু টং ঘরের ইছরে দাড়িয়ে থাকে। পাইন্যেবি তাকে ডেকে বলে "ও কান্দারা আয় আয় ঘর ভুদুরে ব-ইত-ছি।" কান্দারা ইছর থেকে টং ঘরের মাচাং এর উপর বসে বলে "বইন লক্-মই-তমা-ল্লাই- আমা জুম লেছাত্তুন-পাঁ-না-পাঁ-না-গইচ্ছা গুলা-আনি-দিয়ং- দে-।" বলতে বলতে লম্বা -ঝুলানো ব্যাগ থেকে খয়েরী রঙের গইচ্ছা গুলা (গুই গুইটা ফল) বের করে গাবুরী পাইন্যেবির কোলে এক মুঠ দিয়ে উবাগীত সুরে বলে--------

কবরক্ ধানর ধুর্যে রঙ্।
তুই-মুই-উলং- সঙ্॥
গইচ্ছা-সুদা-তুলিবং।
স্যা-উদিলে-উ বং-ফঙ।
ক্ষিং-গরঙর-র-দিন্ দিন্।
তরে ন-দি-বইন-কারে দিন।
ছড়া মু য়ত্-জুর মরং
ঈ-বছর বিশুত-যাবং-চিৎমরং॥
কিনি দিন্দই-বাঙুঁরী।

Scanned with CamScanner

বেছার-ছে-ন-গরিত্-ও-ম-গাবুরী॥
গীতের শেষে সবাই ঢং এর সলে উল্লাস করে ও...হো.....হো..... । পাইন্যেবির কিন্তু চোখ মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়। তারপরও কান্দারা দেওয়া গইচ্ছা গুলা গুলো হাতে ভাগ দিতে দিতে বলে "দ-দ- বইন লক্ কান্দারা পাঁ-না-গইচ্ছা গুলাউন্ খাইনে পরানান- জুর।"

আজ কান্দারার মন খুব চঞ্চলভাব। আজ সে চান্দোকে তার মনের ভাবটুকু প্রকাশ করবে। সে মনে মনে চান্দোবিকে খুব ভালবাসে। কিন্তু তা প্রকাশ করার সুযোগ পায়নি। আজ সে চেয়ে দেখবে চান্দোবি তাকে ভালবাসে কিনা। তাই চান্দোর জন্য এক গোছা গাদা ফুল তার জুম্ম শার্টের পকেটে লুকিয়ে এনেছে। গল্পের সুযোগে পকেট থেকে গাদা ফুলের গোছাটা বের করে চান্দোর মাথায় চুলের খোপায় গুজিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু চান্দোবি টের পেয়ে হাত দিয়ে ফুলের গোছাটা সড়িয়ে দিয়ে বলে "কান্দারা দা কি আই-চ্ছা-পা-য়ল-উ-য়েনি কোন"? কান্দারা আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে "নয়-নয়-বইন- তরে দ- মুই মন চাঁ-য়ত্তে..." কান্দারার চাহনি দেখে পাইনো বলে উঠে-"কান্দারা-ভাই তুই-চান্দোবিরে - পাবার - উলে - সাত খপ্প্যা-টারেঙতুন ঝাম- মারি পারিবে-নে- ছা চিত্তুন-ঝাম-দি পাইল্ল্যে- তে তুই -চান্দোবিরে পাবে- দে- বুইছ্ছইত্"। পাইন্যোবির কথা শুনে সবাই হাসাহাসিতে হৈ-চৈ করে বলে- "গম-কদা-কুইতে তুই- বইন", মরত-পয়া উলে ঝাম মারলই-যা কান্দরা" সবাই হাসাহাসি করে চোখ টিপ্পনি দিয়ে ঢঙ করতে থাকে।

কারবাজ্যা আদাম। কারবাজ্যার উচু টং ঘর। টং ঘরের ইছরের এক কোণে পানির কলসী আর পানি রাখা কয়েকটি ডেক্সী পাতিল। ব্যবহারের পানির জন্য গেলে সাবধানে যেতে হয়। অসাবধানে গেলে টং ঘরের ইছর থেকে পড়ে একেবারে পাতালে।

টং ঘরের খোলা বারান্দায় বেড়ায় হেলান দিয়ে কারবাজ্যা তার দুই হাটু ভেঙ্গে হাটু দুইটার মধ্য খানে ঢুকিয়ে কাল্লাং বুনছে। তাকে দেখে দামপেদা কারবাজ্যাকে বলে "ও-দা-কি-গরত্ তেই" কারবাজ্যা বলে "কাল্লাং-বুনা-না-ওই, আয় - আয়-উঠছি"। দামপেদা কাঠের সিড়ি বেয়ে টং ঘরে উঠে ভাঙ্গা ইছরের সাবধানে পা ফেলে ফেলে কারবাজ্যার সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলে "নমইতকার নমইত্কার" কারবাজ্যা দা। কারবাজ্যা প্রশ্ন করে বলে "তে-তুই-কুদিত্তুন-দাম?" দাম পেদা নম্রসুরে বলে "মাজইন্যাদাই-আদামত্ যাঙর নি তে তরে দি নে ঘরত উদিলুং গে-দা"। কারবাজ্যা কাল্লাং বুনা বন্ধ রেখে ডান হাত দিয়ে কাছে থাকা পানের বাটাটা দামপেদার দিকে ঠেলে দিয়ে বলে "পান-খা-ছা- দাম"। কারবাজ্যা আবার কাল্লাং বুনতে শুরু করতে করতে দামপেদাকে জিজ্ঞেস করে- "মাজইন্যা পুদ বৌ কমলে আনেত্ তে দাম?" দামপেদা ইস্ততঃ সুরে বলে "কি জানং দা,-কইদ-ন-পারঙর-কমলে-আনিব-গই ঘরত বৌ আবার-ন-চায়।" কারবাজ্যা বলে-"আ-মুইদ-শুইন্ নংগে-চান্দোরে অন্য জায়গাত্ বউ দিবাক্"। দামপেদা বলে "মাজইন্যা দ-গম-গুরি-রাগ ধর্মচরনের উবরে" ,কারবাজ্যা বলে "আঃ

Scanned with CamScanner

মাজইন্যা রাগ-উলে-কি-উবদে ছা" আসল কদা উলদে-চান্দোবিত্ তুন রাজী -থা-পুরিব। কারবাজ্যা কথার মাঝে কাল্লাং বুনার বেত শেষ করে পানের বাটাটা কাছে টেনে এক খিলি পান গালে পুরে আবার একটা বেত দিয়ে কল্লাংটা বুনতে বুনতে বলে "মুই-দ-শুইন-নংগে- নংগে-ধর্ম্মচরণ ঝি চান্দোবিরে অন্য আদামত্তুন বৌ-চাইদন্-ছি। মাজইন্যা তারে পুদ বৌ আনি ন পরিব্- পাঁল্লাই। আসল কদা উল-দে মাজইন্যা পয়াবা ভনৃডদে ভন্ড। তা বুইছাঙাভা লারেদে বেদমা দগ্-থাইদেবেলে অয়নি দাম। সি বেদমা পয়াবা কন্ না বেলে জামাই লুবছি কইছা- দে দাম। ধান টেয়া অলা ওক্না পয়াবা আনাভুলা দৃগ। কে নে বলে চান্দোবি তারে জামাই লুবছি"। কথা শেষ না হতে পাড়ার কুশল্যা কারবাজ্যার উচু টং ঘরের কাঠের সিড়ি বেয়ে উঠে ইছরে দাঁড়িয়ে কারবাজ্যাকে দু হাত জোড় করে বলে "নমইতকার নমইতাকার কারবাজ্যা দা," কারবাজ্যা তার দিকে তাকিয়ে বলে "তুই কুদিত্তুন? আয় না বইত্ ছি।" কুশল্যা বসতে বসতে বলে "ধর্মচরনদাই আদামত- যা পরেত্ তে"। দামপেদা একটু রাগত সুরে বলে "তর কি দরকার ধর্মচরণদাই- আদামত যা-না"? কুশুল্যা বলে- "ধর্মচরণল্লই-কদা কয়া-যা পরের"। বলা শেষে কুশল্যা পানের বাটা টেনে এক খিলি পান গালে পুরে আবার বলে "কারণ উলদে তা-ঝি চান্দোবিরে ম পয়াল্লাই বউ তুলিবার কদা ক না। দিন তারিখ ঠিক উলে তা ঝি ই বা আনিন দই"। কারবাজ্যা বলে "অয়নি কুশল্যা? তুই সাঁ- লে ধর্মচরণ ঝি চান্দোরে পয়া বৌ তুললই?" কুশল্যা তাড়াতাড়ি বলে "অ-য়দে অয়দে।" কারবাজ্যা মুখে মৃদু হেসে বলে " আমি স্যাঁলে বলাইন্যা পাবং অয় দাম"। কুশল্যা হাসি মুখে খুশী ভঙ্গিতে বলে-"মুই তমা-নরে-বলাইন ছি দু...।" কুশুল্যা সামনে রাখা পানের বাটা থেকে আরেক খিলি পান গালে পুরে তর্জ্জুনি আঙ্গুল দিয়ে চুন নিয়ে মুখে দিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলে "নমইতকার কারবাজ্যা বেড়াইত বেড়াইত।" বলে ইছর থেকে সিড়ি বেয়ে নেমে গেল। দামপেদা তার যাওয়াটা এক নজরে তাকিয়ে আছে। পরে দামপেদা বলে "কুশল্যা কদা উন বুইত্ ছত্নি দা"? কারবাজ্যা বলে "কুশল্যারে কন্ না ন চিনেত্ তে তে উলদে আদামর ঢেং আমানরে কদা সুনাল-দেয়াই"। দামপেদা বলে "ঢেং-মাইনশ্বর-ঢেং-কদা-কই- পালে তারার -মনান জুরায়।" দামপেদা পানের বাটা নিয়ে এক খিলি পান গালে পুরে বলে-"মুই - উদং- কারবাজ্যা দা"। কারবাজ্যা বলে "অ:- বেলান-দ-দুপুর-উল-থাকা-না-ভাত দ্বিবা খাইনে- যা।" দামপেদা যাওয়ার প্রস্তুতিতে বলে "না-না-দা- আরেক -দিনা- থাইন।" দামপেদা দাঁড়িয়ে বিদায় নমস্কার দিয়ে সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে চলে যায়।

আদামের পুরোনো আম গাছ। আম গাছের নীচে আদামের গাবুজ্যারা দুপুরে সবাই মিলে বসে গল্প গুজব থেকে শুরু করে খেলা, গান বাজনাতে রঙ ঢঙ করে থাকে। নয়াধন, পূণ্যধন, কান্দারা এবং আরও কয়েকজন গাবুজ্যা দুপুরের ক্লান্তি দূর করতে গাছে শিকড়ে বসে গল্প করছে আর হাসি তামাশা করছে। পূণ্যধন বলে- "নয়া দা? কালাচানরেলই চান্দোরে সি দিনা-রাইদত্ থয়াই -পা -ন গেল অয়:?" নয়াধনে বিস্মিত স্বরে বলে "কোন্ দিনা কোন্ দিনা?" পূণ্যধন জবাব দেয় "মামু

রমেশ্যা নয়া ভাত খাত্‌তে দিনা দে"। কান্দারা টিটকারীভাবে বলে "তারার লাঙ্যা লাঙ্যোনী দগ্‌-ভাইলক্‌ তুমি কই ন পার নে।" নয়াধন বলে কালাচানলই চান্দোবি উলাক্‌ কে ভাদ-মাইস্যা মুইন ক-জরা দগ ছাড়াছাড়ি অয়-ন- পারন। কান্দারা বলে "অয়দে অয়দে, ঠিক ভাদ মাইস্যা ক
জরাদে ঠিক"। অন্যরা তামাশার হাসি দিতে দিতে যার কাজে যাচ্ছে।

ভাদ্রের পরন্ত বিকেলে সূর্য প্রায় ডুবো ডুবো। কালাচান জুম থেকে ফিরছে। পিঠে তার কাল্লাং। কাল্লাং দড়িটা বুকের সামনে দুহাত দড়ির মধ্য দিয়ে সামনে হাতে দা টা দড়িতে চেপে ধরে আছে। পথে আসতে পথের মধ্যে পুন্যধনের সাথে দেখা। দু'জনে কুশল বিনিময় হয়। কুশলাদির পর পূণ্যধন বলে "তরে লই-দ-চান্দোবিরে মাইনসে- ভাদ-মাইস্যা-মুইন ক জরা কোই দন, মাইনসো-বদনাম জরাই দন।" তার কথা শুনে বিস্মিত স্বরে বলে "কনে কত্‌ তে তরে ভাদ-মাইস্যা মুইন ক জরা?" পূণ্যধন স্বাভাবিক ভাবে বলে "আঃ-কনে-কত্‌-তে, নয়াধনে দে কত্‌ তে"। তুমি বেলে ভাদ মাইস্যা 'ক' জরা। কালাচান কপাল কুচকে বলে "তার কেয়া এদক ক-না, আমি - যি- উবার অই! পূণ্যধনে বলে "কালাচান ভাই এই কদা-ন্‌ শুনিনে মরে বেচার-ন-গরিত-দে।' এই বলে সে পথ চলতে শুরু করল। কালাচান চিন্তিত মনে তার যাওয়ার ভঙ্গিমা এক নজরে তাকিয়ে আছে আর ভাবছে পূণ্যধন আমাকে কি শুনালো? তার কথা ভাবতে ভাবতে বড় ছড়ায় কুয়ার মত পানিতে স্নান করার উদ্দেশ্যে কুয়ার পাশে বড় পাথরে উপর কাল্লাংটা রেখে একটু জিড়িয়ে নিবে ভাবছে। এমন সময় পাইন্যোবি, কন্যাবি, গন্ধরী ও অন্য দুজন গাবুরীরাও পিঠে কাল্লাং করে হাসি তামাশা করে আসতে দেখে কালাচান একটা পাথরে বসে পড়ে। কাছাকাছি এসে পাইন্যোবি বলে "কি উয়েদে কালাচানদা এদক্‌ ক্যা মু-সুদা? কন্যাবি বলে চান্দোরে কন গাবুজ্যা বদনাং গইত্‌ তন উব আই"। একজন বলে "চিদা ন গরিত দা ত চান্দোরে আরালে আমি -দ- আহি কেন্‌ বোইন লক্‌"। গাবুরীরা সবাই যার যার কাল্লাং রেখে স্নানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্নান শেষে পানি কুয়া থেকে আগে বিজা কাপড়ে উঠে কন্যাবি কালাচানকে কুয়ার অন্য পাশে ডেকে নিয়ে বলে- "আই ছেদ তে কাল্ল্যা চান্দোদাই মুইন ঘরত আই পারিবে নি? আমি বেক্‌ কুনে চান্দোদাই মুইন ঘরত থাবং"। কালাচান বলে "জিদুললই জেদাই-ন থাবাক্‌"? কন্যাবি বলে- "না না তারা আদমত্‌ তুন - ন- আবাক।" কালাচান চিন্তিত স্বরে বলে- "ঠিক আ-হে, ছা -লে- আইন- দে- আই"। কন্যাবি কালাচানকে আড়ালে কথা বলতে দেখে অন্যরা সবাই হাসি তামাশা ছলে বলে- "কালাচানদা লই কন্যাবির কোন লাঙ চলের নি? এদক্‌ক্যেয়া জুর-জুর-কদা"? কন্যাবি ঢং করে বলে "তমাত্‌ তু পরাণে মাইলে তুমিয় লাঙ গরই না বোইনলক্‌"। অন্যরা সবাই ঢঙের হাসি তামাশা করতে করতে যার যার কাল্লাং পিঠে নিয়ে ভিজা কাপড়ে বলতে থাকে "যেই যেই বোইন লক্‌ বেলান ডুবেল্লই।" সবাই লাইন ধরে একে একে রওনা দিল।

ক্রমশ...

Scanned with CamScanner

শ্রী প্রগতি খীসার দুটি কবিতা

শান্তিময় পৃথিবী

(শ্রীমান বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যার উদ্দেশ্যে নিবেদিত)

নোতন সহস্রাব্দের মোহনায় দাড়িয়ে
মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে, উদ্দীপ্ত যৌবনের ছোঁয়া নিঃশ্বাসে তবু
লাল কাল হল পতঙ্গগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক-ঐদিক
কখন কোথায় এলোমেলো করে শান্তিময় পৃথিবী।
ঘনঘোর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির ছায়া আজ।
বিভিষিকাময় মানব সভ্যতা, ফিলিস্তাইনে কিংবা ইরাকে
অবোধ শিশুর রক্তের ছোঁপ ছোঁপ স্রোতসিনি
শ্যামল পৃথিবী হয়ে উঠেছে যেন বধ্যভূমি
শান্তির পায়রাগুলো লুটিয়ে পড়েছে, বহু আগে
ইরাক ফিলিস্তাইনের শিশুদের দোলনার ঘুম
যেন কবরে খুঁজে পায়, ঘুমায় সেখানে শান্তিতে
কারণ হায়েনার বোমা, কালো শনিকভের গুলি ধোঁয়ার নির্যাস
সেখানে পৌছতে দেয়না কারণ কাপুরুষ ভীতু তরা
যদি আবার ঘুম থেকে জেগে উঠে
মহাবীর সাদ্দাম হোসেন ইয়াসির আরাফাত
তখন? পৃথিবীময় সৃষ্টি হবে বিভুসিয়াস আগ্নেয়গিরি
তাইতো তারা হুশিয়ার ভীষমভাবে।
কারণ, তারা জানে তাদের মৃত্যুতে-
কার কিবা এসে যায়?
কার উপরে সঁপে যাবে
ধ্বংস প্রাপ্ত ইরাক ফিলিস্তাইন
বিষাক্ত নীলাকাশ অথবা নিজ প্রজন্মকে।
তাদের কাপুরুষিত কর্মের দায়ভার
কখনো কি নিবে ভবিষ্যত প্রজন্ম? নিশ্চয় নয়-
তাই এখনোই গুটিয়ে নাও
রক্তেরঞ্জিত তোমাদের কাল হাত
বন্ধ করো হত্যা, নির্যাতন
গুলি করোনা তোমাদের শিশুদের বুকে
অকালে বিধবা করোনা আমার মা-বোনকে
এখনো সময় আছে, রক্তের স্রোতধারা বন্ধকরো-
রচনা করি সাম্যের, শান্তিময় পৃথিবী।

২০ মার্চ/২০০৯

প্রেয়সী জুমবী

প্রেয়সী জুমবী-
আদিবাসী ললনা তুমি অপূর্ব সুন্দরী
তোমায় প্রতিক্ষায় রয়েছি ঝর্ণার নালে
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
অবিরাম ছুটে চলেছি
আপন মনে সর্পিল ছন্দের
বুনো মেঠো পথে পথে
এ চলার শেষ নেই।
অবধি হয়না দেখা তোমার সাথে
জীবনের শেষ মোহনায়।
কারণ আমি জানি
তুমিই শেষ নি:শ্বাস
প্রয়সী জুমবী
তোমাকে আলিঙ্গনের প্রতিক্ষায়
এখনো বেঁচে আছি
এমন কি অনন্তকাল পর্যন্ত
তুমি বিনে হয়না সকাল
উঠেনা দিগন্ত জুড়ে সূর্য
ফুটে নাকো ফুলের ডালী
পৃথিবী হয়না আমার পদ্যময়।
ঐ তো অধীর প্রতীক্ষা-শেষ হবে
কোথায়, কখন কোন পথে,
দেখা হবে তোমার সাথে
পথ প্রান্তর, পাহাড়ের কন্দরে
ঝর্ণার স্রোতধারে
নদ-নদীর সাগর তীরে
প্রতীক্ষা শেষ হবে
একদিন তৃষ্ণাত্ব হৃদয়ের।
তোমার আগমনের প্রতীক্ষায়
ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে
হৃদয়ের অসংখ্য কানন
কিন্তু পাইনা তোমার
আগমনী পথ ধ্বনি
তবুও নিরাশায় ভেঙে পড়িনি
বিদর্ণ হৃদয়ে ক্লান্ত শরীরে
নিদ্রা দেবীর কোলে আশ্রয় নিই
কোন একদিন বুক বাড়িয়ে
অপার আনন্দে আমাকে
ছন্দময় করে তুলবে বলে।

-২০ মার্চ ২০০৯

প্রজন্মের পৃথিবী

রাজুময় তঞ্চঙ্গ্যা

আমি এখনো সুপ্ত অবস্থায় আছি,
আমায় জাগিয়োনা হারামজাদা।
আমার অধিকার, স্বাধীনতা মিশ্রিত লাভা
যদি বিস্ফোরিত হয়
তবে তোমাকে নত হতে হবে
আমার প্রজন্মের পৃথিবীর কাছে
তখন তাঁরা তোমাকে ক্ষমা করবেনা
তোমার একমুঠো শান্তির জন্য যে বেয়নেট
আমাকে উত্তপ্ত করে তুলছে
তোমার এক কণা সুশাসনের জন্য যে আগ্রাসন
আমাকে আরো বেশি কঠিন করে তুলছে
তোমার অলিখিত স্বেচ্ছাচারিতার যে বুটের আওয়াজ
আমায়ে পিষ্ট করছে
তোমার সম্প্রীতির নামে বৈষম্যের যে জারজ আচরণ
আমাকে আরো বেশি জীবন্ত করে তুলছে।
তোমার বাহুর যে রঙ্গীন ঈগল, লাল-সাদা
তারা-শাপলা, এসব কার জন্য??
মনে রেখো... হারামজাদা!!!
অখন্ড-ভূখন্ডে সবুজ পদচারণায়
তোমার চাইতে প্রজন্মের অধিকার বেশি।
তাই তোমাকে এবার থামতে হবে।
না হলে আমি নই, প্রজন্ম নয়
পৃথিবী'ই তোমাকে শান্তি দিবেনা।

কাব্য লেখা হয় না আমার

(সদ্য প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শ্রী সুবিমল দেওয়ান
এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত)

শ্যামল তালুকদার

মৃত্যুতে হয় হাওয়া বদল
নতুন দেশে যাওয়া,
মৃত্যুতে হয় এই জনম শেষে
আরেক জনম পাওয়া

মৃত্যু সে এক বিধির বিধান
চলছে হেথায় নিত্য,
মৃত্যুঞ্জয়ী হয় কেউ বা
মৃত্যু হয় তার ভৃত্য।

মৃত্যু সে এক দারুণ শোকের
ব্যথার জোয়ার আনে,
শোকের কেমন তীব্র দহন
মন কেবলি জানে।

মৃত্যু সে এক বীণার তারে
করুণ সুরের কাঁদন,
মৃত্যু যে এক ছিঁড়ে যাওয়া
চোখের সকল বাঁধন।

মৃত্যুরূপী কর্ণধারে
করছে এপার ওপার,
দিনের শেষে ওপারেতে
যাওয়া হল তোমার।

এ যে তোমার মৃত্যু তো নয়
নতুন জনম পাওয়া,
জীবন তোমার থামবে নাকো
থামবে নাকো এই গান গাওয়া।

জন্ম তোমার ধন্য হল
মানব সেবার জন্যে,
কীর্তি তোমার রইবে অটুট
এই যে জনারণ্যে।

সব নদীজল মিশল হেথা
তোমার ঘাটে এসে,
সব পাখি আজ গায়রে যে গান
তোমায় ভালবেসে।

স্মরণ পাড়ে আছ তুমি
রইলে হেতা মহীয়ান,
হল লেখা স্বর্ণ পাতায়
তোমার কীর্তি খতিয়ান।

আসতে যদি চাও যে কভু
হেথায় তবে এসো,
আগের মত ঝর্ণা পাহাড়
আবার ভালবেসো।

রাত্রি জাগা ডাহুক যেন
কাঁদি তোমার জন্য,
কাব্য লেখা হয় না আমার
নেই কো উপায় অন্য।

– ১২ জুলাই'০৯

Scanned with CamScanner

হাফিজ রশিদ খান- এর দুটি কবিতা

যাইনি গভীর বনাঞ্চল

(পার্বত্য বুদ্ধিজীবী শ্রীবীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, সম্মানিতেষু)

একবার তনচংগ্যা গানের হ্রদে একটি ছায়া দুলে উঠেছিল
সায়াহ্নের কালে, রাঙামাটির আড্ডায়
সেই থেকে আমি যাইনি কখনো কাচালঙ গভীর বনাঞ্চল
জুম্মবি তন্দ্রিলা
পাহাড়ি ঝরনায় গা-ধুয়ে প্রত্যেক দিন
ওই বনের পাশ দিয়ে
ঘরে যায়
পিঠে কাল্লাঙ
পা-ফেলার ভারি শব্দ হতো তখন রাস্তায়..

পহ্‌র জাঙাল

Let us live rationally and nationally: G.B. Shaw
পাহাড়ি তরুণ কর্মধন তনচংগ্যাকে

রোদপায়ী পোকাগুলো বিকেলের স্পর্শে শান্ত
সপ্রতিভ ঘাস
আধপোড়া লতার চৌকস মুখ
সন্ধ্যার আসন্ন ঘ্রাণে ঘাড় তুলে দেখছে চারপাশ

সে এক দোল্‌বিঃ সুবেহ সাদিকের আলো যেনো বিহানবেলায়
মাচাঙ বেয়ে নামে জুমভূমির এলাকায়
সোমত্ত অধিকারে

শিশুর হাতের মতো বাড়ন্ত বরবটিগুলো
মসৃণ শসার ক্রমশ মিয়োনো ফুলগুলো কাঁপে
বয়ে-যাওয়া শীতের পলকা হাওয়ায়

যুবতীর জুমিয়া পা চিহ্ন রেখে যায়
ঝোপে-ঝোপে অরণ্যের ফাঁকে

টাটকা শব্জির ভিন্ন-ভিন্ন নাম আর উপনামে
পিঠের কাল্লাঙ ভরে ওঠে ওর..

ইল্-নজিয়া

দিলীপ কান্তি তন্‌চংগ্যা

সূর্যটা ডুবুডুবু করছে। সূর্যের বিরহে নীল আকাশটাও যেন বেদনায় আরও নীল হয়ে উঠছে। পাখিরা সব নীড়ে ফিরে আসছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর কৃষাণ কৃষাণী সবই তাদের ঘরমূখী। একটু পরেই এই মহাপৃথিবী অন্ধকারকে দু'হাতের আলিঙ্গণে বরণ করবে। প্রকৃতির এই বিশ্রামের আহ্বানে সবাই যেন নিজের অজান্তেই সাড়া দিচ্ছে। সূর্যাস্তের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে চিৎপুরী! তার মনে হলো এই মুহূর্তে সবকিছু যেন অন্ধকারে সাড়া দিয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে, সবকিছুর মাঝে যেন প্রশান্তি আসছে। কিন্তু এখনো কেমন জানি এক স্বর্গীয় মধুভরা গন্ধ মৌ মৌ করছে। এই রাত আরো একটু দেরিতে হলে কেমন হতো! মধুভরা গন্ধটা আরও একটু উপভোগ করতে মন চাইলো তার!

এই কাজটি চিৎপুরী প্রতিদিন করে। এটা করতে তার ভালোই লাগে। এর মাধ্যমেই সে তার হারানো স্বপ্নময় অতীতে ফিরে যায়। তার ফ্যাকাশে চামড়া কুচকানো চোখ মিট মিট করে। চোখে ভেসে উঠে এক চিপচিপে গড়নের ছোট্ট চঞ্চলা মেয়ে তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে রাইখ্যাং নদীর পারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইতো, ছোট্ট চিৎপুরীর বান্ধবী রাঙাবী বলছে "দেখ, দেখ! বালির উপর কতো "গুবা পড়েছে!" তার পর চিৎপুরী আর তার বান্ধবীরা গুবা খুড়তে শুরু করলো তখন। তখন তারা কতো কিছুই করতো! রোদ দুপুরে ঘুরে বেড়ানোটা ছিল তাদের শাখ। গ্রামে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার সব খবর তাদের কাচে থাকতো। কারণে অকারণে মাঝে মাঝে তারা অন্য পাশের গ্রামেও যেতো। একবার এক মজার ঘটনা হয়েছিল। তখনো বাঁধটা হয়নি, পাশের শামুকছড়ি গ্রামে তারা মহাজনের ঘোড়া দেখতে গিয়েছিল। দেখার পর ফেরার পথে এক ফেরিওয়ালার সাথে তাদের দেখা। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কানের দুল নিয়ে টাকা না দিয়ে তারা দিল এক ভৌদৌড়। কিছক্ষণ পর তারা পিছনে ফিরে দেখতে পেল যে দোকানদার হাঁসছে! তখন তারা আরও জোড়ে দৌড়তে লাগাল। কিন্তু পরদিন তারা সেই ফেরিওয়ালাকে চিৎপুরীদের উঠানে দেখতে পেল। তারা ভয়ে পালাবার কথা ভাবছে; কিন্তু ফেরিওয়ালা কিছুই বললো না। পরে চিৎপুরী জেনেছে যে, ফেরিওয়ালা নাকি তার বাবার পূর্ব পরিচিত। কোন আশায় অপূর্ণ ছিলনা তার। সে যেন "ডুলুক্কুনি।" সারাদিন শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

হায়! কোথায় গেলো সেই আনন্দময় জীবন। ভাবে চিৎপুরী। বাবা-মা নেই, ভাইয়েরা নেই, বান্ধবীরা নেই কেউ বেঁচে। শুধু জুঙাল্ল্যা এখনো আছে তাঁকে জ্বালাতন করার জন্য! জুঙাল্ল্যাতো এখন খুব বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। একটুও শান্তিতে থাকতে দেয়না। সারাক্ষণই জ্বালিয়ে মারে। বাবা-মা কেন যে তার সাথে বিয়ে দিলো সে বোঝে না! উনসত্তর বছর সংসার করেও এখনো বুঝতে পারেনি সে এই বুড়ো লোকটাকে। তবে তার মাঝে মাঝে ভালো লাগে, বিরক্তও লাগে, মাঝে মধ্যে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু গত মাসে যখন তার জ্বর হলো, তখন জুঙাল্ল্যার কি দুশ্চিন্তা! সারারাত না ঘুমিয়ে তার শিয়রে বসে থাকতো আর মাথায় পানি ঢালতো! তবে কি বুড়োটা

তাকে..........! নাহ্ চিৎপুরী এই বুড়োটাকে বুঝলো না!
কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সম্প্রতি জুঙাল্ল্যা বেশি খিটখিটে হয়ে উঠেছে আর কি সব আবোল তাবোল বলে, পুরানো ব্যাপার নিয়ে ঘাটাঘাটি করে! বলে "যত্নচান যদি বেঁচে থাকতো তবে তোমায় কতো না দেখতে আসতো পিঠা হাতে নিয়ে! আহা বেচারা, তোমার বিয়ের তিনমাস পরেই বিরহের জ্বালায় মরে গেলো। ইস্!" কথা শুনেই চিৎপুরীর গাজ্বালা দিয়ে উঠতো। সে তেড়ে উঠে নিজেকে বাঁচাতে বলে, "এখানে এসেই তো তুমি এক সুন্দরী মেয়ের পিছনে অনেক ঘুরেছো, না পেয়ে কতো কষ্ট তোমার; তাই না!" জুঙাল্ল্যা কোন কথা না বলে তখন গম্ভীর হয়ে বসে থাকতো! দীর্ঘদিন না দেখা সেই প্রথম বেলার রাইংখ্যং গাং এর কথা এই বান্দরবানে তার একটুও মনে পড়ে কি?

জুঙাল্ল্যার কথায় চিৎপুরি যতই প্রতিবাদে ফেটে পড়ুক, তবুও চৌদ্দ বছরের সেই উচ্ছ্বল কিশোরীটির প্রথম প্রেমের কথা তার মনে পড়ে যায়। তখন যত্মচানকে তার সত্যিই ভালো লাগতো। কিশোর বয়সের উষ্ণ-বাঁধভাঙ্গা আবেগ নিয়ে সে সাড়া দিয়েছিলো। তার অনেক কিছুই মনে পড়ে। বিশেষ করে তার সাথে রাইংখ্যংমুখ বাজারে যাওয়া, 'গাড়ি টানা' মেলা দেখতে যাওয়া, কাঁকড়া ধরতে যাওয়া, আরো কতো কি! আর একটা ঘটনা সে কখনো ভুলে যাবেনা! বড়াদাম পাড়ায় "গাড়ী টানা" মেলায় সে গিয়েছে যত্নচানের সাথে। "টেগা গাং" থেকে মেলা দেখতে আসা এক যুবক তার দলবল সহ তখন তাকে জোর করে অপহরণ করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; তখন যত্নচান দা না থাকলে কি যে হতো! বড় বাঁচা বাচিয়েছে যত্মচান দা! আর মেলা দেখে ফেরার পথে সে তাকে উপহার হিসেবে একটা ন্যাড়া মাথার রূপার টাকা দিয়ে ছিলো। রূপার টাকাটা যত্নচান পেয়েছিলো ফারুয়ায় "কাত্তানে" গিয়ে। সেই পয়সাটা এখনো অতি আদরে রক্ষিত আছে শৈশবে মায়ের বুনে দেয়া তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পাইত্ত্বঙে! এসব কথা ঐ ফাজিল বুড়োটা কচু জানে।

কিন্তু ভাগ্য দেবতা তার সাথে লুকোচুরি খেলেছে। বয়স যখন ষোল তখন মা-বাবা "মা-জন" ঘর দেখে "ডোমে-ডোলে" তাকে বিয়ে দিয়েছিল জঙাল্ল্যার সাথে। সে মা-বাবার কথা ফেলতে পারেনি। রাজি হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তার দু:খ হয় যত্মচানের জন্য। বেচারা "আয়ু" পেলনা।
চিৎপুরীর অন্তরটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেন সে অভিমানে চলে গেল। যদিও চিৎপুরী তা বুঝেছিল অনেক দিন পর।

নাহ, রাত হয়ে যাচ্ছে আর তেমন কিছু ভাবতে পারেনা চিৎপুরি।
কান্দারা গরুগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরেছে; দড়ি দিয়ে গরুদের বাঁধতে ব্যস্ত সে। চিৎপুরি সেদিকে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে আর লাঠি হাতে ইছরে একটা বাড়ি দিয়ে তার স্বরে বললো "সুয়াই" মুরগির বাচ্চারা, তোদের এখনো সময় হলোনা ঘরে ঢুকবার; এখনো ইছরের উপর বসে রয়েছো!" কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আবার বললো, "কান্দারা গরুগুলি সব আনতে পেরেছ?

Scanned with CamScanner

ঘরে একটা বাতি দেতো ভাই! বুড়োটা এখোনো তো এলো না"। কান্দারা ঘরে বাতি দিয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ বাইরে বসে থেকে চিৎপুরী ঘরে প্রবেশ করলো। বিছানায় হেলান দিয়ে, মুখে একটু গুল পুরে বসে রইলো। একটু চোখ বুঝতে চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর বিছানা থেকে উঠে দাড়ালো; আর বিছানার শিয়রের দিকে এগিয়ে গেলো, বেড়ায় ঝুলানো ছেড়া-ময়লা কাপড়ের আড়ালে হাত বাড়িয়ে একটি ঘুনপড়া পুরাতন পুটলি বের করে আনলো। বিছানায় নিয়ে এসে খুলতে শুরু করলো বের হলো একটি চকচকে গাঢ় লাল রঙের প্রাচীন পাইত্ত্বং! বেশ কয়ে যুগ আগে শৈশবে তার মা তাকে বুনে দিয়েছিল। কিন্তু এত বছর পরেও একটু ভাঙেনি বা নষ্ট হয়ে যায়নি। বোঝা যায় অনেক যত্নে রক্ষিত হয়ে আসছে এতকাল ধরে। ছোট বেলায় কতো কি যে ঢুকিয়ে রাখতো এখানে তাকি সব কিছু মনে আছে? কাপড়ের তৈরী খেলনা পুতুল কয়া শামুকের খোলস, মালা, দলা খেলার জন্য পাথরের টুকরা, তেতুল বিচি, "চিত্তি" দোকানের কানের দুল, চুড়ি, বনফুল ইত্যাদি- ইত্যাদি। বয়সের সাথে সাথে সবকিছুর পরিবর্তন হয়েছে; শৈশবের খেলার উপকরণ পাইত্ত্বং থেকে বিদায় নিয়ে হয়তো নতুন নতুন জিনিসে তা পূর্ণ ছিল। কি ছিল তাতো তারও মনে নাই। হয়তো কালের সাক্ষী হিসেবে পাইত্ত্বংয়ের গায়ে সে সব জিনিসের গন্ধ এখনো লেগে আছে। কিন্তু পাইত্ত্বংয়ের সাথে তার যে এক গভীর প্রাণের সম্পর্ক রয়েছে তা চিৎপুরি বুঝে! হয়তো তার রহস্যময় প্রাণের কথা ঐ অবুঝ পাইত্ত্বংয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

অতি যত্নের সাথে চিৎপুরী তার পাইত্ত্বং খুললো। সম্প্রতি সে প্রায় প্রতিদিনই যন্ত্রচালিতের মত এই কাজটি করছে। সেখানে রয়েছে তুলা দিয়ে মোড়ানো তিনটি পয়সা। দু'টি রূপার; অন্যটি তামার। এই তিনটি পয়সায় তার সবচেয়ে পুরাতন সম্পদ। কালের অমোঘ নিয়মে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে কিন্তু এ পয়সা তিনটি রয়ে গেছে। সেই কৈশোর বয়স থেকেই তাদেরকে সে মনপ্রাণ দিয়ে আগলে রেখেছে; তার প্রমাণতো এই পাইত্ত্বংয়ের নীরব সম্মতি প্রদান। ঐ যে ন্যাড়া মাথার রূপার পয়সাটি; এর মধ্যেই তো তাঁর জীবনের সবচেয়ে মধুর ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। এটা দেখলেই তাঁর প্রিয়তম মুখ যত্নচান দার মুখচ্ছবি হৃদয়ের অন্তচোখে ভেসে উঠে! যত্মচান দা নাই; কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিরলস বয়ে নিয়ে চলেছে এই পয়সা। আর ঐ যে একটু বড় রকমের রূপার পয়সাটা; এটাও তার অবাধ উচ্ছাসে ভরা কৈশোরেরও স্মৃতি। এটা সে কুড়িয়ে পেয়েছিলো রাইংখ্যং নদীর পাড়ে যখন সে কলসি কাঁখে পানি আনতে গিয়েছিলো। বাড়িতে এসে মাকে পয়সাটা দেখিয়েছে। মা বলেছে এটা এক প্রকারের "আল্লাধন"। যেহেতু পানির কাছ থেকে পেয়েছে হয়তো গরম ধনও হতে পারে। কিন্তু তা সে ত্যাগ করেনি। এজন্যই কি তার প্রিয় মানুষ যত্নচানকে সে হারিয়েছে?

তবে পয়সাটা দেখলে তার এখনো রাইংখ্যং নদীটা মনে পরে। যার পাড়ে এক সবুজ শ্যামল ভিটায় তাদের বাড়িটা ছিল। এ কথা ভেবে তার অন্তর সেই মাতৃভূমির জন্য কেমন জানি এক অব্যক্ত বিরহ ব্যথায় ভরে উঠে। "হ্যাঁ, ঐ তো রাইংখ্যং নদীর ঠিক পশ্চিম পাড়ে একটি নারিকেল গাছের নিচে তাদের সেই "অসল ঘরটা"। যেন এখনো সে দেখতে পায়! সে জানে, প্রিয় স্রোতসীনী

রাইংখ্যং নদীটা এখন আর আগের অবস্থায় নেই। বিরাট এক কৃত্রিম লেকে পরিণত হয়ে সে যেন আগের সেই সহজ–সরল লাবণ্য হারিয়ে ফেলেছে। এখন সেখানে ইঞ্জিন চালিত বড় নৌকা চলে; নকল লেকের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দেখে দূরবাসী বিস্মিত হয়; কিন্তু এখানে এসে চিৎপুরির মনোবেদনা কি তারা বুঝতে পারে? "আহা, কতই সুন্দর ছিল সেই দিন। নদীর দু'ধারে ছিলো সবুজ শষ্যক্ষেত; সবুজে সবুজে মন প্রাণ কেমন জানি খুব উদাস হয়ে যেতো তার। মানুষের কোন সাধারণ অভাব ছিলো না। তখন হয়তো সত্যযুগ ছিল। সেখানেই তো ছিল তার প্রিয় যত্নচানদার শ্মশান। এখন তা পানিতে তলিয়ে গেছে। যদি সে এখনো সেখানে থাকতো তবে প্রিয় মানুষটার শ্মশানে ফুল দিতে পারতো। দীর্ঘ শ্বাস পড়ে চিৎপুরির।

আর তখন বিষু দিনে তারা কৈশোরের বাঁধ ভাঙা উচ্ছাসে মেটে উঠত। ঐতিহ্যবাহী পাঁচ কাপড় আর ঠ্যাংহারু, বেইয়া হারু, আরৎতাল, আলসুলি, রাইত্জু ইত্যাদি অলংকার পরে বিষু উৎসব পালন করতো। রাতভর ঘিলা খেলা খেলতো, গীংগুলি গীত আর উভাগীত শুনে আবেগে চোখে পানি এসে যেতো। নারিকেল ভাঙানো খেলা, নাদেং খেলা, বলীখেলা হতো। "গাড়ি টানা" মেলাও হতো মাঝে মাঝে। কতো দূর থেকে মানুষ আসতো দেখতে তার কোন হিসাব নেই। হায়, কোথায় গেলো সে সব দিন। আবার যদি ফিরে আসতো সেই দিন। নষ্ঠালজিয়ায় বার বার ফিরে যায় সে এভাবে। দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে উঠে বুক আর দুচোখ ভিজে যায়। সব কিছু কেড়ে নিয়ে নি:শ্ব করে দিলো এই বাঁধ। নীড় হারা, ভিটা হারা, দেশ হারা করলো। আর তাদের কে নিয়ে গেলো অপরিচিত বান্দরবান। ভাবে চিৎপুরী। তার মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো কাপ্তাইয়ের ঐ বাধটাই তার জীবনের এই করুন বার্ধক্য নিয়ে এসেছে।

কল্পনা ছেড়ে বাস্তবে ফিরে আসে চিৎপুরী। এবার তামার পয়সাটার দিকে তাকায়। কোথা থেকে যেনো পেয়েছে এটা? কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে; কিন্তু কিছুই মনে করতে পারেনা। তামা পয়সাটার ইতিহাস হয়তো মানব মনের বিস্মৃতির অতল গহ্বরে লুকিয়ে পড়েছে।

চিৎপুরীর সযত্নে রক্ষিত এই পয়সাগুলোর কথা নতুন প্রজন্মের অপ্রাপ্ত বয়স্ক তিনজন নবীন ছাড়া কেউ জানেনা। কান্দারা' আর তার দু'নাতি–নাতনি কিবাচান ও সুবাংপুরি। কিবাচান আর সুবাংপুরি দু'ভাইবোন স্কুলে পড়ে; কান্দারা গরু চরাই। বুড়ির আদরের ধন যে যে ঐ তিনটা প্রাচীন পয়সা; ছোট হলেও এরা বুঝতে পারে। এগুলো যে সে কাছ ছাড়া কখনো করবেনা সেকথা তারা জানে। তবু সে তার নবীন বন্ধুদেরকে পয়সা তিনটা দেখতে দেয়। এরা পয়সা তিনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে; নখের উপর তুলে পিটিয়ে দেখে বাজে কিনা। বুড়ি তখন বলেউঠে "আরে আরে, করো কি? নিচে ফেলে দিওনা। নবীন প্রজন্ম এই প্রাচীন পয়সা তিনটা স্পর্শ করে তাদের পূর্ব পুরুষদের মাতৃভূমি ও ইতিহাসের ছোঁয়া হয়তো পায়। তাইতো মাঝে মাঝে এরা হঠাৎ করে পয়সাগুলো তার কাছ থেকে চেয়ে বসে! কিন্তু বুড়ি দেয়না; বলে পরে নিও।" বুড়ি এগুলো দেবে কি করে? এগুলো দেয়া মানে তার মন থেকে সব সুখ স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া। প্রাচীন এই তিনটা পয়সার মধ্যেই যেন বিগত দিনের ইতিহাসটা ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু পয়সাগুলোর মধ্যেই যে প্রবীনা

Scanned with CamScanner

এই মহিলাটার জীবন অনেকটা জড়িত সেই কাহিনীটা এরা জানেনা। তখন চিৎপুরি তাদের মাঝে গল্প শুরু করে দেয়। তার প্রতিটি কথা এরা যেন গিলে খায়। তাই তাদের উদ্দেশ্যেই তার বক্তব্য বেশি পেশ করে। বলে " শোন; ভাই-বোন লক; গাবুর কাল্ল্যা উলুরে রঅত্, আর বুড়াকাল্ল্যা বানা কঅত্।" ছেলে মেয়েরা না বুঝে হাসি হাসি মুখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। চিৎপুরি তখন এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেমন যেন উদাস হয়ে যায়, কি যেন ভাবে আর বিড়বিড় করে কি যেন বলে! ছেলে-মেয়েরাও তাদের মধ্যে গল্প জুড়ে দেয়। এই সুযোগে একে অপরকে দেখিয়ে ভেংচি কাটে। কিছুক্ষণ পর বুড়ি বাস্তবে ফিরে আসে। কিন্তু আর গল্পে ফিরে আসতে পারেনা। তখন বুড়ি একটু চেচিয়ে বলে "থাম তোরা! পড়তে যাও, আর কান্দারা গরু গুলো দেখে আসো।" মাঝে মাঝে বিরক্ত হলেও নবীন প্রজন্মের মাঝে তার স্মৃতির রোমন্থন করতে চিৎপুরির ভালোই লাগে।

চিৎপুরি তার স্মৃতি রোমন্থন করে আবেগে বিভোর হয়ে পড়ে। হারানো দিনে তার ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়। সে যদি অতীত জীবনটাকে আবার ফিরে পেতো, তার তা নতুন করে সাজিয়ে নিতো। জীবনটাকে ব্যর্থ হতে দিতোনা; স্বপ্নময় পথে তখন সে যেন স্বপ্নচারী হয়ে যেতো। তার পাঁচ কাপড় পরতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে বয়স কি আছে? তবে, হ্যাঁ; সে এখনও পরত; পাঁচ কাপড় যদি তার থাকত। কিন্তু তার "পসা কাল্লাংটা" তো উইপোকায় নষ্ট করে দিয়েছে সেই কবে। আগের মত হলে সে নিজেই বুনে নিতো তার পছন্দমত; আর কাপড়ে ফুল তুলতো তার মনের মাধুরী মিশিয়ে। কালা পিনৈন আর কালা খাদিও বুনত। কিন্তু হায় সেই বয়স বা শরীর তার আর নেই। উঠতে বসতে তার এখন কষ্ট হয়। শরীরটা খুবই দুর্বল মনে হয়। এই তো কয়েকদিন আগেও রান্নার জন্য সে বনে গিয়ে একা কাঠ কেটে নিয়ে আসতে পারতো। এসব ভেবে কষ্ট লাগে তার। সে কি বা করতে পারে? দিশাহারা মানুষদের করার কি থাকে?

একদিন চিৎপুরির গায়ে হঠাৎ জ্বর আসলো। কান্দারা কাজ ছেড়ে এসে তার যত্ন নেয়। জুঙাল্ল্যা বৈদ্য নিয়ে আসে; মাথায় পানি ঢেলে দেয় আর শিয়রের পাশে বসে থাকে। জুঙাল্ল্যার এরকম সেবার সাথে সে পূর্ব পরিচিত। তার অসুখ বিসুখে জুঙাল্ল্যার ব্যস্ততা চিৎপুরির ভালোই লাগে। এই সময়টাতেই সে বুঝতে পারে তার প্রতি বুড়োটার কি টান! জুঙাল্ল্যার প্রতি কেমন এক গভীর অব্যক্ত সহানুভূতি চিৎপুরি তার হৃদয়ে অনুভব করে। তবে চিৎপুরির জ্বর যেন বেড়েই চলেছে।

কান্দারাকে চিৎপুরি একদিন কাছে ডাকে। ঘুনে ধরা ঝোলাটি নিতে বলে। ঝোলাটা খুলে পাইত্ত্বংয়ের মধ্য থেকে তুলায় মোড়ানো পয়সাগুলো বের করে নিয়ে এক মনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ পয়সাগুলো কান্দারার হাতে তুলে দিয়ে বলে "তুমি এগুলো নাও। সযত্নে রেখো ভাই।" কান্দারা অবাক! চিৎপুরির তো এমন করার কথা নয়। তবে চিৎপুরির চোখে এককোঁটা জল দেখা গেলো। সারা দিনের পরিশ্রমে সূর্যটা আজ যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুব তাড়াতাড়ি ডুবুডুবু করছে। আর খালি পাইত্বংটা এখনো সেখানে পড়ে রয়েছে।

চেদন

চন্দ্রসেন তন্‌চংগ্যা

ঝার' দেশত আর' থাবং কোই দিন
থাবং কোই যুগ ধুরি?
য্যেন আলং আগে স্যেন এজ' আহি
নরগ সুক ভোগ গুরি!

দিন মাদান গেল বউত দূর আপ্পায়
সভ্যতায্য ন অয় কম,
উদিলাক কধক শহ্‌র বন্দর নগর
বুদুলি গেল মাইন্‌ষ জীবন।
আমি এজ' আত্ত পুরান সি মন লোই
ঘুরি মুরির তারুম বন!

আমাত্তুন নাই শিক্ষ্যা, ন জানি ইতিহাস
ন জানি হ্‌আদির কন পধত,
যের বানা যের, কিচ্ছু হ্‌মাইত ন পের
যাবং আমি কুদ্দুরত!
কন' দিন কি ন উব' ই সংসারত
চেদন আমা মন-মুরত?

জুন পঅ্য়ান গম্‌ পানা

আলোক কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

আগাসত্‌ মেঘ দিগি
মনান মত্‌ উইবার চাই,
পাইত্‌ সানির গীত্‌ শুনি
মনান্‌ মত্‌ লগ গুই ন তায়।

আগাসত্‌ চান দিগি
ভাবেত্তে ম মনান,
লাই লাই বয়ার বা-আ-ত্‌
গম লাগের ভই্‌ তানান।

দু-অ আগাসত্‌ তারানি চেলে
সুখ্‌কান মুই ফি পাং,
দাক্ষ্যা পাক্ষ্যা জুনি জ্বলত্তুন
দুখ্‌কান মুই পুই ফেলাং।

রা-য় ফুল বাইত্‌ আসেত্‌
ভই নান আগং ইছত্‌,
ই তুম বাইত্‌চান পেনান্‌
গম্‌ লাগেত্‌ মনত্‌।

বৈকাল

মনি স্বপন তঞ্চঙ্গ্যা

হতবিহবল বাতাস বয়ে যায়, বৈশাখ চেনে না
শরৎ চেনে না, পথের ধূলো ওড়ে
সাদা তুলোর মত।
একপাশে আবর্জনা গড়ে, একপাশে কুমারী স্বপ্ন
সবার অলক্ষ্যে থাকে শরীর
তমস্রার বিভ্রমে হুতোম পেঁচা
ডাল ধরে এগোয় সামনের ঝোঁপে
দিবানিদ্রায় শুধু ঝোঁপ, বিষাক্ত সাপ
আর বিষে নীল শরীর, দহকালের কথায়
মন মজে, মন পড়ে থাকে-পিপাসার
সাধ মিটায় দেহান্তরিত ঘাম।
কালো চুল ওড়ে জলের ঢেউ
শুধু কুল খোঁজে-
চঞ্চল দেহে বিবস্ত্র শীত।
এখানে বাতাস মিশে মাটির গায়ে,
রাঁধাচূড়ার সাথে
শুকনো ফুলশয্যা পাতে।
একগুচ্ছ ভাঙ্গা ডাল কুড়িয়ে
জমিয়ে রেখে, দহণে বাস্প
ছড়িয়ে ক্রমান্বয়ে বৈকাল।

Scanned with CamScanner

আমি কেন স্বপ্ন দেখি

নির্মল তঞ্চঙ্গ্যা

স্বপ্ন ব্যথিত জীবন বৃথা,
আর বৃথা জীবনই মূল্যহীন।
স্বপ্ন ব্যথিত জীবন পঙ্গু ও অচল।
দিনের আলো যদি না থাকতো, রাতের অন্ধকারটা
মূল্যায়ন করা যেতোনা।
সুখ যদি না থাকতো, দুঃখকে মূল্যায়ন করা যেতোনা।
মানুষ হাসতে যদি না জানতো, কাঁদতেও জানতোনা।
প্রেম–প্রীতি, স্নেহ–মায়া-মমতা যদি না থাকতো, বিরহের
কষ্টের অনুভূতিগুলোই মূল্যায়ন করা হতোনা।
আর আমি স্বপ্ন দেখি কারণ আমি আমার মাকে
যেমন ভালবাসি, আমার দেশ ও জাতিকে ভালবাসি।
তাইতো স্বপ্ন দেখি জীবনে মহৎ কোন কিছু করব বলে
তাইতো সপ্নকে বলি; তুই আমার পাশে থাকিছ,
আমার জীবনে চলার সঙ্গী হতে।
স্বপ্ন দেখি আত্মমানবতা সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করব বলে,
স্বপ্ন দেখি দুঃখীনি মায়ের মুখে হাসি ফুটাব বলে।
স্বপ্ন দেখি নিজের দুঃখকে বিলীণ করব বলে
স্বপ্ন দেখি, দেখছি, দেখতে থাকবোই...
জানিনা স্বপ্নগুলো কতটুকু পূর্ণতা লাভ করবে (?)
তবুও হতাশ হবোনা।

বৈকালী মেঘ

শ্রীজ্ঞান তঞ্চঙ্গ্যা

স্মৃতির শহরের বেনামী এক পুরুষ আমি
জলে ডুবে মরলে কলি–
শেষ রক্ষার আগে চলে গেলে তুমি।
তোমার পুকুরে এখন শুধুই ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক;
তৈলাক্ত ডাবের খোসা আর ঘন ঝাউ গাছ।

শেষ চিঠিটির উত্তর পায়নি–
বৈকালের সমূদ্রের ঢেউ সব ভেসে নিয়ে গেল,
তাই তোমার স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো আর সাজায়নি।
এখন হাসলে আর দাঁতগুলো বের হয় না।
তুমিই তো ডাকোনা, তাই আমি আসিনা।

মায়ের প্রতিক

প্রমিলা তন্‌চংগ্যা

মাগো তোমার মুখের হাসি
দেখলে লাগে মায়াবতী।
তোমার নিচের চরণগুলি
আশীর্বাদ বলে মাথায় তুলি।
তোমার ঐ হাত দুটি
সন্তানের স্নেহের ভালবাসার গতি।
তোমার মাঝে চোখগুলি
জ্ঞানের আলোর মতন দেখি।
তোমার হাতের ঐ চুড়ি
রয়েছে বাবার ভালবাসার জুড়ি।
তোমার মুখের ঐ কথা
হয়েছে মোদের মাতৃভাষা
মাগো তোমার ঐ শাসন
সন্তানের সু-পথের দিক নিদর্শন।
তোমার হাতের ফসল ফলা
সোনর দেশ গড়ে তোলা।
যে মাটি জন্ম তোমার
সেই মাটি গর্ব আমার।
সেই মাটি মোদের জন্মভূমি
প্রিয় মাতৃভূমি।
মাগো তোমার পোশাকগুলি
বিশ্বের মাঝে জাতির পরিচিতি।
মাগো তুমি হচ্ছো দেশের
মহৎ এক মায়ের প্রতীক।

ভিন্ন ভিন্ন

এনি তন্‌চংগ্যা

বিভিন্ন রঙে, বিভিন্ন সাজে,
ভিন্ন ভিন্ন, ব্যথা চরিত্রে,
কত রকম মানুষ আছে
এই সুন্দর পৃথিবীতে।
হেটে হেটে, চলতে চলতে
কিছু ব্যথা, বলে ফেলা,
হাসতে হাসতে, বন্ধত্বতা,
হঠাৎ করে, করে ফেলা,
বিভিন্ন রকম মানুষের মাঝে
ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা।
স্বপ্নকে ভালবাসা
স্বপ্নে মাঝে ভেসে চলা
বিভিন্ন বন্ধু আত্মীয়
ভিন্ন ভিন্ন আদর ভালবাসা।
বিভিন্ন বিশ্বাস আর অবিশ্বাসে
জীবনে পথ চলা
ভিন্ন ভিন্ন জীবন পার
সুখে দুঃখে ভরা কাল।

Scanned with CamScanner

তনচংগ্যা শব্দকোষ

সংগ্রহে ঃ কর্মধন তনচংগ্যা

[তনচংগ্যা ভাষার শব্দ ভান্ডার বেশ সমৃদ্ধ। কিন্তু এগুলি সঠিক সংরক্ষণের অভাবে কালক্রমে ভাষার পাশাপাশি শব্দের যে মৌলিকতা বা স্বতন্ত্রতা রয়েছে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। এর মধ্যে অনেকগুলি আবার হারিয়ে গেছে। মূলত এ হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকে রক্ষার জন্যই এই প্রয়াস। এর দ্বারা বাহিকতা বজায় থাকবে- সামনে অন্যদের সহযোগিতা কামনা করছি।]

অল-কস = বাড়াবাড়ি / অতিরিক্ত

অলর = চুপ

অ-সন = পরিমাণ

অমা = বড়

অঙ = নিঃশ্বাস / স্থির করে থাকা

অসৌউল = শোধ করা

অউৎ = চেতনা/ চেতন

অছল = উপরে / উঁচু

অআ = ইচ্ছা পূরণ

অউসো = ঠিকতো

অক্ = সত্য

অলানী = বমি।

অস-মর = দুষ্টামি না করতে বলা (গোসলের সময়)

অয়া = উৎসব বিশেষ

অক্ উলে = সত্য হলে

অদিনীমাদানে = অবেলায়

আদে আদে = হাতে হাতে

আমি = আমরা

আদেদুরি = নিজে নিজে / হাতে হাতে

আমূক = অবাক

আসক্ = বিরক্ত

আনি-ছা = আনতো

আন্ = এনো

আসক বাচক = শরীর ভালো না লাগা

আমুচ্ছ্যা = গোসল না করলে শরীর যদি খারাপ লাগে

আঙাচুখ = অকাজের / সন্মান না করা

আত্তালি = মন চাওয়া / তামাশা করা
আসাচ্ছ্যা/ আনাচার = ময়লা (পানি)
আরাকারা = ময়লা
(বানের পানিতে ভেসে আসা গাছগাছালি)
আসিক = খালি।
আউসে = আবদার / আগ্রহে/ খুশি হয়ে
আউত্ = ইচ্ছে
আমত্ তল =ইচরের নিচে
আক্কেয়াঙ = নিত্য / অভ্যাস হওয়া
আন্তারে বান্তারে = রাতের মধ্যে
আরোঙ কারোঙ = হাঁড়গোর
আবাংবাং = একেবারে খোলা
আগ্ গাদা = নষ্ট করা /
খাবার এলোমেলো করে রাখা
আপ্পাল =আগে
আক্কল = সাধারণ জ্ঞান
আপ্পার = আগে চলে যাচ্ছে
অউৎ গরের = খেতে ইচ্ছে করছে
আপ্পাং আপ্পাং=আগে যেতে চাওয়া
আউৎসাই/আউলাই=
সামনে গিয়ে আগলে থাকা
আদুর = পঙ্গু
আলগ গরা = আলগানো
আইত্তা = দাদু
অক্ত = ঠিক/ যথার্থ/ অর্থ
কালাঙ কালাঙ = খোলামেলা
আমক = অবাক
আচঅত্ = আকাশে
আইসাই = পরিমাণ মতো
আই-সাই = গিয়ে এস দেখি /
পরিমাণ মতো
আইৎ কার = অস্ত্র / হাতিয়ার
আসি যানা = হারিয়ে যাওয়া
আত্টালি = হাত তালি / তামাশা
আদিককেয়া = হঠাৎ

আন্দার/ আনৃতার = অন্ধকার
আইচ্ছ্যা = আজকে
আহ্য়ত = আস্ /আছ
আমা নরে/আমানে= আমাদেরকে
আমানে / মেরে = নিজে
আচর = বাতাস/ আঘাত লাগা
আঁঙ = মান্য করা
আরাকাছা = জুম পরিস্কার করা
বরাঙা = শ্বশুরের মা
সুরি = শ্বাশুরী
সুওর/সুউর = শ্বশুর
সুরুং = স্মরণ করা
আই টেক্কে = আগে থেকে
আক্কা = যেন দেখা না যায়
কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া
আউদানা = নখ দিয়ে আচড়ানো
আলুং = এসেছি / ছিলাম
আইত্তারা = মাটিতে বসা (ঘরের ভিতর)
আদ্দান = অর্ধেক
আদদান্ন্যা = মানসিক ভারসাম্য ব্যক্তি।
আহ্রা = কয়লা।
আন্দাচ্ছ্যা = শুধু শুধু / মিথ্যে করে
আইচ্ছ্যা = স্বস্তি না পাওয়া
আহে = আছে।
আকুচ্ছ্যা =এখন রোপন / কাটা হয়নি।
ইবিলিক / শতান = দুষ্ট
ইনসাব/ইসাব = হিসাব
ইক্ষুনো = এখনো/ এখন
ইংসা = হিংসা
ইয়তনে = এখানে
ইত্তুক = অল্প/ কম।
ইয়োন = এগুলো
ইদুক্কান = এতগুলো

Scanned with CamScanner

ইরিদেওয়া/দেনা = ছেড়ে দেওয়া
ইয়োন = এগুলো
ইকিক = না
ইক্ = ইচ্ছা পূরণ/ না করা
ইক্‌কিনিমানে/ ইক্তুমানে = একুট হলে
ইমান সে = এই মানুষে
ইমানত/ ইমানে = নিজে
ইজ্জা-ইজ্জা = গা ছাড়া ছাড়া ভাব
ইচর = ঘরে সামনে উচু মাচাং
ইক্ষু = এখনি
উরি উরি = উড়ে উড়ে/
পা দিয়ে চেপে ঢুকানো
উরাউড়ি = পা দিয়ে ডলা ডলি
উড়ং উড়ং = উড়বে উড়বে ভাব
উই-উ = আঘাত পেয়ে মুখ দিয়ে
যে শব্দ বের হয়
উইদুঙ = হতাম
উরিঙগলা = লম্বাগলা।
উনা = কম
উড়ুরাই = বেগে ছুটে আসা
উঙগুরুঙ = অসহ্য গরম গরম ভাব
উদুলা = খালি গা / রাখা
উবুরী উঠা = শরীর কেপে উঠা/ ভয় পাওয়া
উবুরী পরা = গাছ মাটি থেকে উঠে যাওয়া
উচ্ছয়া = সহজ
উদি পরা/উবর ভরা = উপছে পরা
উবুরে = উপরে
উবা = উচু
উদি = ওখানে
উল্টয়া = উল্টো / অমান্য
উলুংগে = হচ্ছি
উদুরার = গরম পানি বুদবুদ করা
উসুনা = সিদ্ধ
উসুলার = কোথাও যাওয়ার জন্য
অনুরোধ করা

উদুলা = উলঙ্গ (গায়ে সার্ট না থাকা)
এরা =মাংস
এচেন সাইন = অতিরিক্ত দুষ্ট
এনে এনে = শুধু শুধু
এনেক কেয়া = এইরকম
এবেল সেবেল = ঝেলেমেলে/প্রচুর
এয়ং = ঘুমের মধ্যে কথা বলা
এদক্ষণ = এতক্ষণ
এডা = উচ্ছিষ্ট / লক্ষী
এইকমুক্কেয়া = যা বুঝে একটি বুঝা
এমুক্কেয়া = এইদিকে
এলান = হেলান
এক্‌কেনে মানে = একটু হলে
একঝলা = এক পসলা /
হঠাৎ করে বৃষ্টি আসা
এককোউ = প্রতিদিন / সবসময়
কুন্দি = কোন দিকে
কুদি = কোথায়
কমলে /কমত্তে = কখন
কারে = কাকে
কিচাগ = চিৎকার
কাসৃসৎ =স্বভাব
কিরি-কর = গর্বকরা
কেরেংঝাল = ঝগড়া / ঝগড়াটে
করত = কুলে (শিশু)
কুরিদি = কিনারে
কাদাকাদি = ভীর হওয়া
কুয়া ঝিরিঝিরি = নিরব নিরব ভাব
কেনাকেদেক্ কেয়া= কিছু পাওয়ার
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা
কেবায় / কেয়া = কেন / কিজন্য

Scanned with CamScanner

কে-নে = কিভাবে
কিবা = আদর
কন্না = কে
কু-দে = বলতে
কুরে = কাছে
কড়া = কলি / কচি
কুরে কুরে/ কেরে কেরে = কিনারে কিনারে
কিলিং কিলিং = উপরে পড়বে এমন
কঅ = বল /ঘুঘু পাখি
কদা = কথা
করৎ = গজানো অর্থে
কুজ্জাল =ঝগড়া
কুইত্তারি = যে কাউকে কিছু দেয় না
কাল্লাঙ = ঝুড়ি
খিসাখিছছ্যা = জোর করে।
খোং = চুড়া
খোঅত = পদচিহ্ন
খাইন = খাব (ভঃ এক বচন)
খাবং = খাব (ভঃ বহু বচন)
খায়ং = খেয়েছিলাম (অঃ এক বচন)
খায়ি = খেয়েছি (অঃ বহু বচন)
খাংগর = খাচ্ছি (বঃ এক বচন)
খের = খাচ্ছি (বঃ বহু বচন)
গাদাগদি = একসাথে অনেক জন থাকা
গাদাগাদি = শুধু গর্ত
গাদ্ / গাত্ = গর্ত
গরয়া = অতিথি।
গাই = একা / গাভী
গাইগাই = একা একা
গুরি = চূর্ণ হওয়া
গনাই = সন্নিকটে
গনা = গননা করা
গেত =বীজ থেকে কিছু গজানো
গোসাই = গুছিয়ে রাখা
গসাই = কোন কিছু দেওয়া
গরত্ = বাড়িতে
গুরুঙ গুরঙ = বিকট শব্দ (আকাশ)
গুলুচ্ছান = অল্প একটু
গুবিং = গভীর
গিগিরার = কাপছে
গাব = রঙ
গোদার = ধাক্কা দিচ্ছে
গোগুরার = ভিতরে আওয়াজ করা
গেয়া = শরীর
গিজ্যা = ঘিরে ধরা
গিছাগিচ্ছ্যা = এক সাথে অনেক/ চাপাচাপি
গমেদুলে = ভালকরে
গুলুচ্ছাল = অল্প
গত্তা = পথ
জাঙাল = পথ
পহ্র = আলো
লাঙ্যা = প্রেমিক
লাঙনী = প্রেমিকা
আঘ = লেখাপড়া
গত্তাল =পুরোটা
গাবুর =যুবক
গাবুরী =যুবতী
গোউত্ গাইত =সাজিয়ে রাখা
গর্ =কর
গুসাঙ = মাথা সামনে রেখে কোমর বাকা করে থাকা
বানা ইসু =শুধু মাত্র
পরেয়া =অন্য
তা ঢক্কেয়া =তাহার মত
ফয়ালা =ফাকা

Scanned with CamScanner

ফুউল্লা = আলগা
চদরবদর/বেদের চেদের = অনেক
ভাইল/ লোলুং = তোষামদ করা
বা-না = শুধু
পরব/পেয়/পেঅ =উৎসব
র-অ/রয় =আওয়াজ /শব্দ
বয়্‌ত/শেয় = বয়স
রয়াঙ =হারিয়ে যাওয়া
পেয়ং =মচকে যাওয়া (পাতিল)
ছয়াল = ঝগড়া
ছয়াদ = স্বাদ
ছয়ার =তাপ্‌পর
বেঁয়া = বাঁকা
ঝেলেমেলে = অনেক আরামে
ছবা = শূন্য
ছবাখাল / চিদাখলা= শ্বশান
সুয়ানা = শুকনা
ছল্ল্যা = বুদ্ধি করা
জোন / জুন = চাঁদ
ছদরৎ = ভাগ্য না থাকা
ফসলা = উর্বর
বউত্‌ / বয়োত = সাধনা / অনেক / বস
জউত /জয়োউত= সুবিধা
বালুক্‌কান = অনেক
সপ্‌পদার = কথা বলার সময় চটপট করা
টয়া = খুজা
টাউছুমা = অকেজো / অকাজের
ফেয়ক = নষ্ট
ফেঅ =বিনাস / ধ্বংশ
দবা = দল।
ডাঁঅর =বড়
চেয়ং = কাটার সময় বাকা হওয়া
চেলা = নেতা
ধুচা = গরা।
জি-না = পেরে উঠা
মাদি = মাটি
লারে লারে = আস্তে আস্তে
লুদিক =লাঠি
মোলা =মামা
লেছা বসর = গত বৎসর
লেছা =নিচে (জুম)
রিনি চানা =চেয়ে দেখা
সিনা = বিচ্ছিন্ন
পাঅল / বেদেমা/বুল = পাগল / বোকা
ঢাই তনা = ঢেকে রাখা
কেয়র ব্যয়র = আঁকাবাঁকা
ঢক = ঢং
বুয়ার/বঅ = বাতাস
বঅ = ছোট নাইলন সূতা
জিয়ান পাই = যেটা পাই / নানারকম
মেলাহেলা = খোলামেলা
ধুব/ধুউব = সাদা
বেদেরাং =অনেক
পেক্‌কয়া/পেক্‌ =কাঁদা
চেদের বেদের= এলোমেলো
লো–মারা = ছুড়ে ফেলা
ধউল/লাবা = সুন্দর
টেঙত = পায়ে
চেমেলে = মশকারী করা
ভরণচুরণ = পরিপূর্ণ
লাছা = লজ্জা
লাহানা = রোপন করা
ফাল্লানা = লাফানো
মা-অ-না = ফ্রি

নরম করম =শক্ত না
ডরাং =ভয়
ফরুয়া = ধনেমানে
বচং = নষ্ট / খারাপ
লেঁদা = ছোট/নরম
নাঅত = নাকে
চাইকাত্তি = চারিদিকে
কন্না = কে
জেদা =জীবিত।
তাউয়া = ধনী
লোইল্যে চোইল্যে= নড়াচড়া করলে
পেয়ক = নষ্ট হয়ে যাওয়া (মেশিন)
ঝাবাং ঝাবাং /ভায়ং ভায়ং = ভেঙ্গে পড়বে অবস্থা
ছেড়ে ছেড়ে = মাঝখানে মাঝখানে
মেরেয়া = শুকনো
ছালে = তাহলে
বারাবাজ্যা = অতিরিক্ত দুষ্ট
ধুরোং = গর্ত
বুক্তি = মোটা
ফোঙ = অলৌকিক ক্ষমতা
পাদরা = ভিরু / যে ভয় পায়
চুরুৎগিরি / গুরি = হঠাৎ করে/ তাড়াতাড়ি
চিবাবাদে = শুধু শুধু/ খালি খালি
লারে লারে = আস্তে আস্তে
সোমং = ঢোকা/চুমু অর্থে
জউত = সহজ
বাহা = বাসা (পাখি)
টেডা = জিৎ করে থাকা
মুসুঙ = সামনে
পিছেদি = পিছনফেরে।
ছাবাত = ছায়ায়
ছাবা = ছায়া
মনত্তুন = মন থেকে
চং সং =সমান সমান
ব্যাক্কুন = সবগুলো
ভাগগুরিবং = ভাগ করব
দক্কেয়া = মতো/ ঢংকরা
ওক = হউক
জো = সঠিক সময়ে
সিত্তুন = সেখান থেকে
বেয়াদাই = মেলে রাখা।
মহ্গি = অবাক করে
মহ্ = অবাক
পআ / প-আ = ছেলে / জন্ম
মাত্তর = শিক্ষক
দোলগি = সুন্দর করে
থঅত্ =রস (মাটি)
রঅত্ = রস (ফলের)
থাইত = থেকো
থুম = শেষ
নারং = গালমারা
নানো = মালিক / দাদু
সোমি = গন্ধ শুকে নেওয়া
তুমি = তোমরা
তুমি = আপনি (মান্য করে- ছোট বড়)
তুই = তুমি (কাছের/বন্ধুকে)
গুরুয়া = ঘরের মানুষ
নেক = জামাই
মোক = বৌ
জিরান = অবসর
জিয়ান পাই = যেটা পায়/ নানারকম
ডরেবরে = ভয়ের মধ্যে
বিল্লয়্যা / মুলুক পরা = ভবঘুরে/ যে বেশি বেড়ায়
দুদাদুদি = হাটাহাটি (দুষ্টমি অর্থে)
দুয়াদি/ ঝাদি যাদি = তাড়াতাড়ি/ তাড়াহুড়া

Scanned with CamScanner

সাটিক = ভরণপোষণ / শাসন
দিদ্‌দারী = বিরক্ত
পঙ = মিশিয়ে / জোড়া বেধে দেওয়া (বিয়ে)
পেয়াং = কোনকিছু কাটা (মাছ/মুরগী)
পেপেরার = চটপট (পশুপাখি)
দবরার = চটপট (মানুষ)
বলবলা = শক্তি দেখানো
দ-র-ম-র = কোন কিছু না পেয়ে পাওয়া
মককরক = অন্যের জিনিস নিজের মনে করা
ফপার = জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়া
টাকটানের = আহত অবস্থায় শ্বাস নিঃশ্বাস নেয়া
হকরার = নড়াচড়া করা (অলক্ষ্যে)
লরের = নড়ছে
বারাবাজ্যা = দুষ্টমি করা/শয়তানি করা
টয়ার =খুজা
পেদায় পানা =কুড়িয়ে পাওয়া
জিননী = বলবলা
দয়াই = পাহারা / লক্ষী
বুরিলে = পূর্ণ হলে
কুরিদি = কিনারে
দাইদি = সাইডে
দাঅর = বড়
পাদল = পাতলা
দোমবুজ্যা = উদ্ধতা
লোউত = আতিথেয়তা
চোখপেদানা =নাক গলানো
ঝাইটপঙ = মিশিয়ে/ মিশ্র করে
বানা বানা/ এনে এনে = শুধু শুধু
বদ্‌দরা = সহ্যকরা
পুলের = আস্তে আস্তে রাগ করে উঠা
বদাবদি = হাতাহাতি (ঝগড়া অর্থে নয়)
পিচ্ছল = মসৃন/ সমান
রিসাইদে = সন্দেহ করা (বৌ-জামাই)

সাঙা = বিয়ে অনুষ্ঠান
দেবা = আকাশ
ছেপপুদা = আশির্বাদ
পরার = জ্বালা/ জ্বালাতন করছে
দবাচ্ছা = অবেলা /
উভয় সংকট/ অসময়ে
রয়াং = নিখোঁজ হওয়া
দবাই/সংবোকা =সমান ভাগ
বাচ্ছাই /বাছাই = অপেক্ষা
বাতছাই = গণনা (বৈদ্য)
সারাব/সারাপ = অভিশাপ
দমুছা = মোটা মোটা/ গোলগাল
জাধি / জারী/ যারী = হজম/তাড়াতাড়ি
চেবেদা = চ্যাপ্টা
ঘনা = জমির কোনা
গিল্লই = গিলে ফেলো
দউত = হোচট
দউত্ = দোষ
লাসাই = লজ্জা
লাসাই = লজ্জা পাই
লাসান্তে = লজ্জা পাচ্ছে
শিয়া = শিখতে
টেক্ = বাকা পথ
টাকটানো = হঠাৎ আঘাত পেয়ে
যে পিপাসা করে
টং টং = রাগ রাগ ভাব
উল্‌লয়া = পূনরাবৃত্তি / কথা না শুনা
পেয় = উৎসব
জম্বা = কতবড়
অমা = বড় / অনেক
মিউলা = মেঘলা (আকাশ)
পফা = জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়া
ফেসেরা = ময়লা
মিসাইদ /নিসাইদ = নিঃশ্বাস

মিসাইদ পাদালি =নি:শ্বাস অস্বাভাবিক হওয়া
পাদালী =অস্বাভাবিকভাবে শুয়া
পুনদুরী-মখ =উল্টো করে থাকা /সহজে কথা না শোনা
লা-কা = পাতলা
মিসাইদ অঙ = নি:শ্বাস শক্ত করে থাকা
সাল্লুয়া = শক্ত (আঘাত পেয়ে
শক্ত করে থাকা)
অঙ = কোন রকম (আঘাত পেয়ে
শক্ত করে থাকা)
আদ্য খুশি = নিজের ইচ্ছায়
টেডেলা = অআগ্রহ
সুশুরার =সুরসুরী করা
দোসী = কাছাকাছি (জায়গা / জুম)
দসা = বিপদ
দলা = মাটি/ পাথরের টুকরো বিশেষ
ইদাল = কোনকিছু নিক্ষেপন
বিসর = রোপনের জন্য তৈরি করে রাখা বীজ
সিউদ = হাটার পথে হটাৎ শরীর ব্যথা পাওয়া
টলমল = এদিক ওদিক ছুটাছুটি
ছেলা =বড়
রোই গিয়ে = বয়ে গেছে
ধার/ধাত্তে = পালাচ্ছে
ধা অ = পালাও (এ: বচন)
পুদানা = জন্ম হওয়া (গরু/ছগল/
কুকুর/পশু-পাখী)
পঅ = পা বাড়ানো
ধঅ / ধাঅ = পালিয়ে যাও (ব: বচন)
ধঅ = নাও
বেবেককেয়্যা = আঠালো
সুধাম্/ মুসুধা = গোমরা মুখে থাকা
মুমুজ্যা = যেটি সহজে ভাঙে
সিঅত = সেখানে।
টাঅত = হঠাৎ (ঘুম থেকে জাগা)
পাইত্তং = পানের বাতি
সিরা = আলাদা/ একা

দেম্বা = অসমান
দেমা = গোলাকার
(মাথায় আঘাত পাওয়ার পর ফুলে উঠা)
বাআ = রাত্রিযাপন/ পাখির বাসা বিশেষ
দুরাঁই = তাড়িয়ে দেওয়া
লুদা = ভেজা অবস্থা / শান্ত
(অ)কুল্ল্যা = যে সহজে ভয় পায় না
জয়াব = উত্তর
স-আইত = সঙ্গ দেওয়া (ভয়ের ক্ষেত্রে)
পেদা/ পেদাই = কুড়িয়ে নেওয়া / পাওয়া
দুক = আঘাত / কষ্ট
দৌর/ধূর = গর্ত/ছিদ্র/কচ্ছপ
সাদআ = পশু পাখি
সঅল = সহজ
চিন্দাবাইত = মাছ/মাংস কাটালে
যে গন্ধ বের হয়
পাচ্ছানা/ পাতসানা= বিশ্বাস করা
ছাই ছাই = দেখে শুনে
ছাঙ ছাঙ = দেখি দেখি
মুসুজ্যা =মুছড়ানো
সানসিক =নিজেকে বড় লোক /
ভাল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা
বোববুদার = মুখের ভিতর গালমন্দ করা
হদা/ খদা দেওয়া= পরে অভিযোগ করা
বেয়জ = অজ্ঞান
ঘেল = দুর্বল
উয়ানসু = প্রলাপ বকা
থামাংচে টক = ভাত না খেয়ে ঘুমালে
শরীরে যে অসুবিধা হয়।
পয়াচ্ছা = ভোর বেলা
কুদি/কুচ্ছা = টুকরো করা
বায়ু ফেরা = মন ফেরা
চোখ পেদা = নাক গলানো

Scanned with CamScanner

ক-র-লা =অনেক (একজায়গায় অনেক জিনিস থাকা)
সঙ = সমান
সঙ মত্তুরে = মাঝখানে
নারং = গালমারা/ বেশি কথা বলা
উরঘুম = কম ঘুম
উবর ঘুম = বেশী ঘুম
ঝারা/ ঝারি = সবগুলো ফেরে নেওয়া (ফল)
পেরকা = ময়লা (শরীর)
বুয়ার = বায়ু
পুলি-ব = ভালো/ ফল হবে
সিককেয়া = পুড়ে খাওয়া
তবরার = শীতে কাঁপা
উবুরী = ভয়ে হঠাৎ গা কেপে উঠা/ গাছ উপরে পড়া
উড়ুজ্জ্যা = দ্রুত চলমান পানি (পাহাড়ী ঢল)
সুশুজ্জ্যা = পিচ্ছিল
মেদল = মাটিতে বসা / অলস
দেৎসাইট = গালি অর্থে
দিক ফেলাই দিয়ে = খাওয়ার সময় চোখ পড়া
মেদেরা = একেবারে নরম হয়ে যাওয়া
মিডিরি = রান্না তরকারীর শেষ অংশ
পেকপেদাই = বেশি কথা বলা
তুচ্ছার = বিরক্ত
নী-রা = ময়লা(পানি ছাকার পর যে ময়লা)
নীরাই = সেকে নেওয়া
পান্‌সা কুড়ুগুলা = বোকা / বেকুব
সাআত্ = উদ্বোধন
ঝাইট পং = যেটা পায়
মোসুঙে/নে = সামনে

কাসাই = কুড়িয়ে নেওয়া
সুমৎ = সাড়া দেওয়া
পিসুন = বদনাম
মা-না-নেই/নই = সেজন্য তো
অলং অলং = বমি বমি ভাব
কাদ্য/ হাদ্য = অনুরোধ
অদর/ অদরান = যেটা সেটা / অগেরটা
অদেছু = হয়তো/ হতে পারে
অইদু = হবেতো
অয়নি/ অয়নেছা = তাই নাকি
ঝকপাই = কেউ আঘাতে পেলে খুশি হয়ে হাত তালি দেয়া
ইসা-ইসা =মনে মতো লাগা
ঝাইটপঙ =বাছ বিচার না করে একসাথে অনেক জিনিস
জেয়ত পাই = যেখানে সেখানে
যিয়ান সিয়ান = যেটা সেটা
লরালুরি = দৌড়াদোড়ি
জুরোয়া = মন মরা করে বসে থাকা
দাব্ = আগ্রহ
জুদা =আলাদা (পরিবার)
জয়ার = ঠিকঠাক
গম্‌মারা = কথা বলা
ফুস্‌সানা = কান্না করলে থামানের চেষ্টা
প্রাইন = উপহাস/ভিন্ন নামে ডাকা
দাঙবাঙ = সামান্য পরিমাণ খাওয়া
লাদাপাদা = শাক-সজী দিয়ে খাওয়া
চিৎচালৃলয়াহ = নিষ্ঠুর / চিত্ত কোমল নয়
উড়ায়ে/উড়ানা = থেমে যাওয়া (বৃষ্টি)

.... চলমান

Scanned with CamScanner

লেখক পরিচিতি

ড. মনিরুজ্জামান– *সাবেক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ও ডীন, কলা অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*
শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা – *বিশিষ্ট লেখক ও সংস্কৃতি কর্মী, রাঙামাটি।*
ড. জীনবোধি ভিক্ষু– *অধ্যাপক, প্রাচ্য ভাষা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*
পার্থ শঙ্কর সাহা– *ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সেড–এর কর্মরত।*
কর্মধন তনুচংগ্যা– *ছাত্র, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*
শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা– *লেখক ও ডাক্তার, রাজস্থলী।*
লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা– *শিক্ষক, রাজস্থলী।*
বি.এন. তঞ্চঙ্গ্যা– *সমাজকর্মী, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।*
শ্রী প্রগতি খীসা– *নান্দনিক তরুণ কবি ও সাহিত্যিক, রাঙামাটি।*
শ্যামল তালুকদার– *সংস্কৃতিক কর্মী, রাঙামাটি।*
হাফিজ রশিদ খান– *কবি ও সাংবাদিক, চট্টগ্রাম।*
রাজুময় তঞ্চঙ্গ্যা– *ছাত্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*
দিলীপ কান্তি তনুচংগ্যা – *ছাত্র, ইংরেজী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*
চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা – *দেবতাছড়ি, কাপ্তাই।*
আলোক কুমার তঞ্চঙ্গ্যা– *বিলাইছড়ি, রাঙামাটি।*
শ্রীজ্ঞান তঞ্চঙ্গ্যা– *ছাত্র, আইন বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*
মনি স্বপন তঞ্চঙ্গ্যা – *ছাত্র, পরিসংখ্যান বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ।*
বিমল তঞ্চঙ্গ্যা–*ছাত্র, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*
প্রমিলা তঞ্চঙ্গ্যা– *ছাত্রী, রাঙামাটি মহিলা কলেজ।*
এনি তঞ্চঙ্গ্যা – *ছাত্রী, ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙামাটি।*

যাদের কাছে কৃতজ্ঞ

প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা– *সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।*
ডাঃ নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা– *সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।*
অভিলাষ তঞ্চঙ্গ্যা– *সদস্য, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।*
নিবারণ তঞ্চঙ্গ্যা– *ব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক, বান্দরবান।*
ক্ষেমা রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা– *ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, রাজস্থলী।*
রাজীব তঞ্চঙ্গ্যা– *UNDP, রাজস্থলী।*
ডাঃ আশীষ তঞ্চঙ্গ্যা– *মেডিকেল অফিসার, F.P.A.B. নানিয়াচর, রাঙামাটি।*
অজয় তঞ্চঙ্গ্যা– *আদিবাসী উন্নয়ন কেন্দ্র, রাজবাড়ী, রাঙামাটি।*
জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা–*চেয়ারম্যান, বিলাইছড়ি উপজেলা, রাঙামাটি।*
অনুমদর্শী তঞ্চঙ্গ্যা– *ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, টেলিটক, রাঙামাটি।*
নাজীব তঞ্চঙ্গ্যা– *কৃষি উন্নয়ন বোর্ড, বালাঘাটা, বান্দরবান।*

Scanned with CamScanner